সমরেশ ও অন্যান্য গল্প

শৈবাল মিত্র

কবিপত্র প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ ঃ
চৌঠা আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী মিনতি মুখোপাধ্যায়
২২বি. প্রতাপাদিত্য রোড,
কলকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমতী ছবি ঘোষ
মেসার্স জি, ডি. এণ্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড. সাহাপুর,
কলকাতা-৭০০০৩৮

পরিবেশক ঃ
বুকমার্ক
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
পরিকল্পনা—সুবোধ দাশগুপ্ত
শিল্পী—সমরেশ মুখার্জী

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিক

জীবনানন্দ খ্রি. ১৯৩০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে খ্রি. ১৯৩৫-এর শুরু পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট স্থায়ী কাজকর্ম করার সুযোগ জোগাড় ক'রে উঠতে পারেন নি। এই সময়ে তাঁর নিজের অপছন্দের নানা রকম টুকিটাকি (ও তাঁর নিজের ধারণায়, অবমাননাকর) কাজটাজ ক'রে কোনও প্রকারে দিন গুজরান করেছেন পারিবারিক মানসিক ও আত্মিক ভাবে বিবিধ অব্যবস্থায় উৎপীড়িত হতে-হতে। এই রকম আর একটা সময় তাঁর জীবনে এসেছিল খ্রি. ১৯৪৬-এর পরে, যখন প্রথমে তিনি আংশিক ও পরে পাকাপাকি ভাবে তাঁর নিজের শহর বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চ'লে আসেন দেশভাগের ঠিক আগে এবং ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঠিক পরে। কলকাতায় চ'লে আসার পরে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁর অনুজ অশোকানন্দর বাসাবাড়িতে—শুরুতে তাঁর নতুন সংসারে একসঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত, পরে, অশোকানন্দ সপরিবারে ত্রিকোণ পার্কের গায়ে তাঁর স্থির আস্তানায় উঠে গেলে, ভাইয়ের ছেড়ে-যাওয়া বাসাবাড়ির একাংশে, সপরিবারে, ল্যান্সডাউন রোডে।

তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির বেশির-ভাগই লিখেছেন তাঁর জীবনের এই দু'টি সর্বাঙ্গীণ ভাবে দুর্দশাপ্রপীড়িত কালপর্বে; সাধারণ ভাবে বাংলা দেশের অনতিঅতীত ইতিহাসেও এ দু'টি কালপর্ব ছিল খুবই অনিশ্চয়তা- ও অস্থিরতা-সমাকুল; হয়তো এই সব সময়েই তিনি গল্প-উপন্যাস লেখার মতো সময়সাপেক্ষ কাজে হাত দেবার মতো নিরবচ্ছিন্ন অবসর পেয়েছিলেন, এবং সময়টাকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবার তাড়নায় কবিতার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস রচনারও প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন; নানা প্রকার হতাশা ব্যর্থতা আশাভঙ্গ ও অসম্পূর্ণতার আঘাতে পরিক্লান্ত হতে-হতে তিনি বেশি-বেশি ক'রে সৃষ্টিপ্রাণিত হয়ে পড়ছিলেন।

এই বইতে একত্রিত হতে পারত পনেরোটি গল্প। দু'টি গল্প আগেই 'প্রতিক্ষণ'-প্রকাশিত গল্পসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ব'লে এই বইতে তেরোটি গল্প গ্রন্থিত হল। প্রথম আটটি গল্প তিনের দশকের শুরুর ক'টি বছরে লেখা (খ্রি. ১৯৩০-৩৪) এবং শেষের দিকের পাঁচটি গল্প লেখা হয়েছিল চারের দশকের অন্তিম পর্বে (খ্রি. ১৯৪৬-৪৮)। প্রথম গুচ্ছের গল্পগুলির রচনাকাল নানা রকম আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক তথ্যের

উপর নির্ভর ক'রে অনুমান ক'রে নিতে হয়েছে, যথাক্রমে খ্রি. ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৪; উনিশ-শো তিরিশের গল্প চারটি লেখা হয়েছিল যখন, বিশ্বমন্দার শুরুতেই তিনি তাঁর কলেজমাস্টারির চাকরিটা খুইয়েছেন, অকৃতার্থ ভাবে বিবাহিত হয়েছেন, এবং পরের পাঁচ-পাঁচটা বছরের বেকারির ও ক্রমাগত চাকরি খুঁজে বেড়াবার সাধ্যসাধনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন; এই আবহটা অল্পবিস্তর তাঁর প্রায় সব গল্পেই রয়ে গেছে, বেশি ক'রে তিরিশের দশকের গল্প ক'টিতে।

অন্যান্য গল্পগুলির রচনাকাল নির্ণয়ে তেমন কিছু গবেষণাকর্ম করতে হয় নি, তারা যে-সব মলাট-যুক্ত বা -বিযুক্ত খাতায় লিখিত ছিল, তাদের মলাটে/প্রথম পৃষ্ঠাতেই রচনার স্থান/কাল বা উভয়ই লেখক-কর্তৃক নির্দেশিত ছিল। উদাহরণ হিসেবে পূর্বে গ্রন্থভুক্ত 'সোমনাথ ও শ্রীমতী' গল্পটিকে নিয়ে তিনটি গল্প যে-খাতাটিতে লেখা হয়েছিল, তার কথা বলা যায় : খাতাটির মলাট ও প্রথম পৃষ্ঠায় 'Stories/Jibanananda Das/August, 1946'—এই কথাগুলি স্বহস্তে লিখেছিলেন জীবনানন্দ; 'বাহাদুর' ব্রান্ডের এই রুলটানা খাতাটির পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য কাটাকুটি ও গ্রহণ-বর্জন, এবং মাঝে-মাঝে কোনও পৃষ্ঠার সাদা অংশে বাংলা বা ইংরেজিতে লিখিত কোনও চিন্তাসূত্র, যথা, 'একটা সমুদ্র আছে', 'হুঙ্কার ক'রে Children-কে ডাকা', 'All about pump' ইত্যাদি—এই সবও ছিল; গল্পগুলি লিখেছিলেন তিনি খুবই দ্রুত তালে, ঘোরের মধ্যে থেকে যেন প্রায়, যেন লিখবার সময়ে তাঁর মাথার ভিতরে পরিপূর্ণ ভাবে 'দৃষ্টিলোকী' হয়েই ছিল তারা, পাণ্ডুলিপিতে যতি ও অন্যান্য চিহ্ন ব্যবহারের অসঙ্গতিতে যা ধরা পড়ে। আবার, 'বাঘিনি' গল্পটি যে কীটদষ্ট রুলটানা খাতাটিতে আছে, তার মলাট নেই, মলাটটি খুলে প'ড়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে নানা হাতে ঘোরাঘুরি ক'রে-ক'রে-ক'রে, কিন্তু খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠাতে লেখা আছে : Short stories/Jibanananda Das/Cal Aug 1946, এবং একেবারে শেষের পৃষ্ঠায়, ...National Book Agency/...over time—"/Science & Society—"/Theatre Today—/Trident—; এই লেখাটিতে কাটাকুটি গ্রহণ-বর্জন কম নয়, যা হয়তো পরবর্তী কোনও সময় করেছিলেন, পেনসিলে-কালিতে। এ-রকমই, যে মলাটহীন রুলটানা খাতাটিতে আছে 'সমরেশ' ও 'পারিজাত' গল্প দু'টি, তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে : Poems/Poems/ J.Das/Calcutta/ March/1946; প্রথমে লিখেছিলেন 1947, '7'-এর ওপরে কালিতে '6' বসিয়ে করেছেন 1946; খাতাটিতে কবিতা আছে তিনটি, শুরুর সাতটি পৃষ্ঠাতে; কিন্তু খাতাটির সিংহভাগ জুড়ে আছে উল্লিখিত গল্প দু'টি এবং দু'টি ছোটো প্রবন্ধ; পরিমার্জন-পরিবর্ধনের মাত্রা এই লেখাগুলিতেও কম নয়। অন্য যে-গল্পগুলির রচনাকাল নির্দেশিত ভাবে পাওয়া গেছে, তাদের বেলায়ও ঘটেছে একই রকম প্রায়। তিনের দশকের গল্পগুলিতে তুলনামূলক ভাবে পরিমার্জনার বহর অনেক কম। যে-সব গল্পের রচনাকাল অনুমান ক'রে নিতে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অনুমানের সাহায্যকারী সূত্র ছিল প্রধানত তিন রকমের : ক. তাঁর হাতের লেখার ধরন ও লেখার সরঞ্জামের রকম-সকম;

খ. আগের যুগের এক্সারসাইজ-খাতার পিছনের মলাটে ইসকুলের ক্লাস-রুটিনের যে ছ'দিন-পাঁচ পিরিয়ডের খোপ-কাটা ছক থাকত সাধারণত, তার শীর্ষে একটি বছরের নির্দেশও থাকত, লেখকের নিজের হাতে লেখা বছর-নির্দেশের অভাবে রুটিনে উল্লিখিত বছরে বা তার সামান্য পরে বিশেষ লেখাটি তৈরি হয়েছিল ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় মনে হয়েছে; গ. কখনও-কখনও যে-খাতায় তিনি লেখাটি লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রচনার কোনও তারিখ লেখেন নি বটে, কিন্তু খাতাটির অন্য কোথাও বাজারের ফর্দ বা কাজের রুটিন লিখেছেন সাল-তারিখ দিয়ে, সে-ক্ষেত্রে রচনার বছরটিও একই হবে ব'লে ভাবা হয়েছে; অথবা, কোনও খাতার ভিতরে হয়তো তিনি কাঁচিতে মাপ-মতো ক'রে কাটা এক বা একাধিক চিরকুট রেখেছেন, যাতে তিনি সন-তারিখ দিয়ে ড্যাশসমাকুল লাইনের-পর-লাইনে stray points, story points বা ইত্যাকার কিছু লিখে রেখেছেন, যা থেকে আন্দাজ করা হয়েছে যে, সেই বিশেষ খাতাটিকে যে-রচনা বা রচনাগুলি রয়ে গেছে, তাদের জন্মকালও তাহলে এই সব চিরকুটের অনুরূপ হবে। সূত্রগুলি সব আলাদা ভাবে বা যুগপৎ ব্যবহার করা হয়েছে। ভুল হতে পারে, এই রকম পরোক্ষ সব সূত্রের সাহায্য নিতে গেলে ভুল হতেই পারে; তবু অনন্যোপায় হয়েই তা করা হয়েছে। এক 'সমরেশ' ও 'সোমনাথ ও শ্রীমতী' ছাড়া কোনও গল্পের নামই তাঁর নিজের দেওয়া নয়; কোনও-কোনও গল্পের নামকরণ করা হয়েছে গল্পের কোনও-না-কোনও পাত্র-পাত্রীর নামানুসারে, অন্যত্র গল্পের থেকে একটি পছন্দমতো বাক্যাংশ বেছে নিয়ে গল্পের শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছে।

জীবনানন্দ তাঁর সাক্ষাৎ জীবনযাপন সূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর গদ্যরচনার অবলম্বন করেছেন প্রায়শ, এই গল্পগুলির বিষয়নির্বাচনেও তার অন্যথা হয় নি : খ্রি. ১৯৪৬-৪৮এ রচিত গল্পগুলি যেমন ভাবে সবাই দেশভাগ-সমাসন্ন এবং/বা দাঙ্গা-মন্বন্তর-যুদ্ধ-সদ্যস্বাধীনতা-বিধ্বস্ত কলকাতা শহরে দিনাতিপাতজনিত জটিলতায় আক্রান্ত, তিনের দশকের গল্পগুলি সে-ভাবে নয়; সে-গল্পগুলিতে বরং বেশি ক'রে অর্থনৈতিক মন্দা-প্রপীড়িত বাংলা দেশ প্রলম্বিত ছায়াপাত করেছে।

যে-সব খাতাপত্র থেকে গল্পগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের চেহারা দীর্ঘ কালাতিপাতের জন্যই প্রধানত খুবই দুঃস্থ হয়ে পড়েছিল; তা ছাড়া, তারা যে খুব একটা যত্নআত্তিতে রক্ষিত ছিল, তা-ও তো নয়। জীবনানন্দর বেশির-ভাগ পাণ্ডুলিপির খাতা যখন খ্রি. ১৯৪৬-র প্রথম দিকে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে চ'লে গেল, তখন যারা গেল না, তারা নানা রকম পারিবারিক ঘটনাবিপর্যয়ে অশ্রদ্ধায় হতমানে এখানে-সেখানে অবহেলিত প'ড়ে থেকেছে প্রায় বস্তাবন্দী হয়ে উপযুক্ত অভিভাবকত্বের অভাবে। জীবনানন্দর জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং কন্যা মঞ্জুশ্রী খ্রি. ১৯৪৬-এ পরলোকগত হলে তাঁর যেটুকু-যা অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে জাতীয় গ্রন্থাগারের বাইরে, হারিয়ে-টারিয়ে যাওয়ার পরেও, তা শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশ উদ্ধার করেছেন, এবং নিজের চেষ্টায় সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলেছেন। তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর হেপাজতে

থাকা খাতাপত্র থেকে এই গল্পগুলি তুলে আনা হয়েছে, এই কপিকারের সীমিত যোগ্যতা- ও সাধ্যসাধনা-সাপেক্ষে, বলা বাহুল্য। গল্পগুলি যে এই বইটিতে পাশাপাশি স্থাপিত হতে পারল, তা তাদের কোনও মূল গুণগত সহধর্মিতার কথা বিবেচনা ক'রে নয়; খ্রি. ১৯৯৫-র পরে যে-খাতাটি যখন হাতে এসেছে, তখনই তাতে যে-রচনাগুলি বিধৃত আছে, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ নির্বিশেষে, কপি ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সময়-সুযোগ অনুযায়ী, প্রয়োজনের দাবি মিটিয়ে। এই রকম ক'রে-ক'রে এখন দেখা যাচ্ছে যে, উদ্ধার-করা গল্প জড়ো হয়ে গেছে পনেরোটি; দু'টি গল্প আগেই গ্রন্থভুক্ত করেছেন 'প্রতিক্ষণ'; প'ড়ে আছে যে তেরোটি গল্প, তারা এই বইয়ে রচনাকালের ক্রম মিলিয়ে গ্রথিত হল। আমরা অন্তত গল্পগুলির সঙ্গে সেই খুঁজে-বার-করা কপি-করা থেকে যে-ভাবে জড়িত হয়ে আছি, তাতে জানি যে, গল্পগুলি দুই মলাটের ভিতরে একসঙ্গে এল এ-বার।

গল্পগুলি এর আগে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক পত্রগুলির সম্পাদক-প্রকাশকদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক গল্পগুলি গ্রন্থিত হল; প্রথম প্রকাশের সময়ে তাঁরা যে অশেষ আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, কোনও সাধুবাদই তার তুল্যমূল্য নয়।

ছন্দে বন্দে

কাল রাত থেকে আমি [illegible]

ক্যাম্পে দেখছি ওরা চালের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible]

তখন আসছে ফসল। চাঁদের দোকানে বড় একটা না পেলেও

নেমিয়ে [illegible] [illegible]। [illegible] হাটে যাবো। সেদিন [illegible]

তেমাথা শীতের রাত, নারিকেল পড়বার কাছে [illegible]

দোকানে ঝাঁপ পড়ে যায়। পরক্ষণে এলোমেলো [illegible]

যেন আমাদের চোখ দুটোকে কয়েদী করে নিতে চায়।

খুঁটে খুঁটে খাই, চোখে দুধে জলের ছাট দেই, চেয়ার টেবিলে

শিরদাঁড়া টান টান করে বসি.. কিন্তু তবুও ঘুম।

কয়েকটা রাত এভাবেই কেটেছে, গায়ে লেপমুড়ি ঘুমোবার

ঘুমোই, রাত [illegible], বসে ঘুমোই, দাঁড়িয়ে ঘুমোই

এর একটা কিছু দেরি দরকার ছিল। এক বিষয়ে [illegible]

চোখে জল। একবার বাম একদিন অন্তর একদিন ঘুমোতাম;

একবার [illegible] বিনাই ঘুমোতে, একবার বাম্প চোখে

ফিরোজের দেখা নেই। [illegible] ধুরিখাঁর হাতে [illegible]

[illegible], নীচে ও কাছে কয়েকটা সিগারেট।

মাঝে মিছে চা খেয়ে গড়িয়ে গায়ে লেপমুড়ে।

ঘোর ঘোর [illegible] খাচ্ছি। কাজ করি না [illegible]

[illegible] এ হবে না। [illegible] চাইনা; ঘুমও চাইনা।

ছাদে ব'সে

ছাদে ব'সে তার কাছে আমি গল্প করছিলুম।...

ওই যে ক্যাবিনটা দেখছ ওটায় চায়ের সঙ্গে কফিও বিক্রি হোত। আমি তখন কলেজে পড়তুম। চায়ের দোকানে বড়ো একটা না গেলেও সে-দিন যেতে হয়েছিল।...তার দু'টো কারণ। সে-দিন ছিল শীতের, জেয়াদা শীতের রাত, আর-এক জন পড়ুয়ার কাছে শুনলুম, ও-দোকানে কফি পাওয়া যায়।... পড়াশুনা এগজামিনের সময় ঘুম যেন আমাদের চোখ দু'টোকে কায়েমি ক'রে নিতে চায়।...অল্প-স্বল্প খাই, চোখে মুখে জলের ছাঁট দেই, চেয়ার-টেবিলে শিরদাঁড়া টানটান ক'রে বসি...কিন্তু তবুও ঘুম।

কয়েকটা রাত এন্নিতর তচনচ হয়ে গেছলুম।...দুপুরে ঘুমোই, রাতে ঘুমোই,— ব'সে ঘুমোই, দাঁড়িয়ে ঘুমোই। এর একটা বিহিত কোরব ভাবছিলুম। এগজামিনের মাস খানেক মোটে বাকি।...এক জনে বল্লে, এক দিন অন্তর এক দিন ঘুমোও; এক জনে বল্লে, দিনের বেলাটা ঘুমোও; এক জনে বল্লে, চোখে কেরোসিন তেল দাও।...ভারি ব্যারিস্টার হবেন যে-নীরেন, তিনি বল্লেন, আরে, ও ক'ষে কয়েকটা সিগারেট—।

আমি নিজে চা খেয়ে হায়রান হয়ে গেছলুম। পেটের থেকে প'ড়েই চা খাচ্চি।...যত কড়া-ই করি না কেন, ও-ওষুধে আর ধরে না।...মেজাজও চড়ে না; ঘুমও চটে না। মাঝের থেকে লিভারটা কেমন বিগড়ে যেতে লাগল। ডিসপেপসিয়া শুরু হোল।...এক দিন মনে হোল যেন গ্যাস্ট্রাইটিস হয়েছে।...ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিলুম। চা ছেড়ে দিলুম। চোখ টিপে সিগারেট শুরু করলুম; এক দিন জ্ঞান-দা হস্টেলে এসে আমাকে ফুঁকতে দেখে কানজোড়া এন্নি মুড়ে দুমড়ে দিয়ে গেলেন, আর সবাইকে ব'লে দেবেন ব'লে এত শাসালেন যে, ওটা লুকিয়ে অন্ধকারে আড়ালে দেয়ালের পিছে কিংবা ল্যাট্রিনে গিয়ে টানতে হোত।...

কিন্তু জ্ঞান-দা ভারি হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। এক দিন তার সাগরেদ দু'-দু'টো ডিটেকটিভ আমার নামে নালিশ পেশ করতেই আবার সেই কান

আর বল্লেন—দু'-দু' বার ক্ষমা করা গেল; তিন বারের বার

সে-দিন দশটার সময় ঘুমটাকে যখন কিছুতেই আর বাগিয়ে রাখতে পারছিলুম না, তখন গোপীন খাস্তগিরকে ডেকে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বল্লুম, আমায় জাগিয়ে দিস ভাই রাত দু'টোর সময়—।... গুপে সারাটা রাত পড়ত। দিনেও এক কী দেড় ঘণ্টা মোটে ঘুমোত।...ওর চেহারা ছিল ভালুকের মতো, কথা কইত শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে—হাসতো এক খট্টহাসি।

আমি জাগিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করতেই ও আমাদের বাড়িখানার তিন-তিনটে তলা চৌচির ক'রে এক চণ্ড-চামুণ্ডা হাসিতে আমাকে সম্ভাষণ করলে—অনুমোদন করল। ঘুমটা চোয়াড়ে না হোলে তখনই চট্‌কে যেত। গুপীকে এম্নি এক মাস ধ'রে তালিম ক'রে আসছি। সে-ও আমাকে নেহাত বেয়াড়ার মতো রাত দু'টো-তিনটের সময় ঠেলে-ঠেলে-ঠেঙিয়ে এক বার বসিয়ে দিয়ে যেত। কিন্তু দু'-চার মিনিটের ভেতরে আমি আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমে কুঁকড়ে পড়তাম।...এলার্ম ওয়াচে নিয়মিত দম দিয়ে রাখতুম।

ঘড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে যেত,—কিন্তু তাতে ক্বচিৎ জাগতুম। মনে কোনও বিভীষিকার ছাপ পড়ে নি।...

সমস্ত ফন্দিফিকির বরবাত।...গুপী আজও জাগিয়ে দিল। আজও ঘুমোলুম।...পরদিন মুখ কাচুমাচু ক'রে নীরেনকে এই সব কথা বলছি, এম্নি সময় গুপে এসে হাজির। নীরেন বল্লে—কী গুপে-দা, তোমরাই রাত জাগবে; এ-বেচারা যে এগজামিনের আগে ঘুমিয়ে ঘায়েল হয়ে গেল, একটা বিলি ক'রে দাও।...

সেই নোংরা কালো মদ্দা শরীরখানার পুরু-পুরু চর্বির ভাঁজে-ভাঁজে সে দুমড়ে দুলে উঠতে লাগল...সেই হাসির আড়ালে কী কয়েকটা কথা ফুটে বেরুল, বুঝতে পারলুম না। শুধু ধরতে পারলুম : ঘুম; ঘুম! এগজামিন!...দু'টো তিনটে...চা কফি...কফি! নীরেন আর আমি এ-বার লাফিয়ে উঠলুম। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র মিলে গেছে। আমরা গোপীদাদাকে নমস্কার সম্ভাষণ জানাবার আগেই সে কোথায় বিলীন হয়ে গেছল। মনে হোল যেন মহেশ্বর স্বয়ং এসে বর দিয়ে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর এক দিন কফি কিনে পাঁচ-ছয় রাত্তিরের মধ্যেই আমরা চার-পাঁচ জন পোড়ো তা স্রেফ সাবাড় ক'রে দিলুম।...গুপেকে ভুললুম না। এক দিন কফি খেতে ডাকা গেল। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে তিন পেয়ালা উড়িয়ে তবে সে কথা বল্লে...জীব...ভাইসাহেব...সিমলে পাহাড়...সেজোমামা...কফি...আর কিছু বুঝতে পারলুম না।... যাক; গুপে-দার জীবনচরিত লিখছি নে।... সে আর-এক অধ্যায়—অপরূপ জিনিস!...আমরা এমন বে-হুঁসিয়ার ছিলুম যে, এক দিন রাতে কফির টিন খুলে দেখি নস্যির টিপও নেই। তখন রাত প্রায় এগারো। দোকান সবই বন্ধ।...ঘায়েল!...এ এক টিনই আমাদের বোর্ডিঙে টিমটিম কচ্চিল।... কে-ই বা কফি খায়,—নামই-বা শুনেছে ক'জন!...তিনকড়ি ঝাঁ ক'রে এসে বল্লে—দার্জিলিং কেবিনে যাও, কফি পাবে—যদি খোলা থাকে।

—রাত এগারোটার সময় কোন কেবিন আবার খোলা থাকে?

—ওটা থাকে।

নীরেনকে বল্লুম—চলো

—কোথায়

—দার্জিলিং ক্যাবিনে

—খ্যাপা—ব'লে নীরেন আলগোছে স'রে পড়তে লাগল।

তার ঘাড় ধ'রে সনাক্ত করতেই সে ফসকে গিয়ে বল্লে—একটা রাত ঘুমোলে মারা যাবে না।

নেহাত অনিচ্ছায় বেরলুম। দোকানটা বাস্তবিকই খোলা ছিল। আশেপাশে দোকানপাট সবই বন্ধ। রাস্তায় লোক নেই বল্লেই হয়। চায়ের দোকানি শুধোল—কী চাই

—কফি এক কাপ।

—কড়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ

পাশের কামরায় খানিকটা খুটখুট শব্দ হবার পর কাপ এসে হাজির হোল . শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর মখমল বিছানো। তার ওপর ডিশ কাপ ইত্যাদি রাখবার দস্তুর। মনে-মনে ওদের তারিফ ক'রে বল্লুম—বেশ তো!

চার দিকে দেয়ালের গায়ে ছবির বাহার, একটা ফুলদানিতে তোড়াও ছিল।

আমি কাপ শেষ ক'রেছি ক'রেছি এমন সময় দেখলুম কচি-মতন একটি মেয়ে এসে হাজির।...অবাক!...শেষ চুমুকটা পেয়ালায়ই র'য়ে গেল।...মেয়েটি আমার দিকে এক বার ফিরে তাকাল—তারপর এক কাপ কোকো চাইল।...হুঁ!..

মেয়েমানুষকে সাইকেলে চাপতে দেখেছি, মোটর চালাতে দেখেছি, ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি, ...কিন্তু চায়ের দোকানে ঢুকতে দেখি নি।...অবিশ্যি এ-দোকানটা যদিও ড্রয়িংরুমের মতোই, রাস্তায় লোকজনের ভিড় যদিও নেই-ই এখন,...তবু...।

এতগুলো টেবিল থাকতে সে বসলো এসে আমার টেবিলেই। ইলেকট্রিক লাইট তার মুখের ওপর পড়েছিল, মনে হোল, এ যেন কোনও গ্রীক কবির মূর্ত কল্পনা।...

সিদোসিদি সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।...

চোখের ভেতর কোনও দুষ্টুমি নেই।...

সমস্ত মুখের বাঁধুনিটাই একাগ্রতা ও নিবিড়োতায় ভরা।...

আমি আর এক কাপ কফি চাইলুম।

কোকো সে-ও চেয়ে নিল এক কাপ।

অনেক ক্ষণ ব'সে ব'সে দু' জনে খেলুম।

মুখোমুখি। এক টেবিলে।

কোনও কথাবার্তা হোল না।

রাত তখন প্রায় বারোটা।

মস্ত বড়ো একটা হাই তুলে দোকানি বল্লে—এই বেলা দোকান বন্ধ। গোল মুখখানা হাসিতে ভরা।...

রাস্তায় একসঙ্গে নেমে পড়লুম দু'জনে। ...একটা খেকি কুকুর খ্যাঁক-খ্যাঁক ক'রে একটা মরখুটে বিড়ালকে তেড়ে এল।...'ধেবৎ' ব'লে কুকুরটাকে সরিয়ে দিলুম।...

মেয়েটি জানোয়ার দু'টির দিকে এক বার তাকাল, আমার পানে এক বার...তারপর চ'লে গেল।

সে-দিন রাতে ঘুম হোল না বটে।...

পর দিন সকাল বেলা সেই দোকানে যেতেই বাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাল একটা ছাতা ফেলে গেছলেন?

বল্লুম,—ব'লে ফেল্লুম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।...মেসে নিজের কামরায় এসে ভালো ক'রে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলুম দিব্যি ছাতাটা, আনকোরা, সিল্কের প্যারাসুট, চমৎকার হাড়ের ডাঁট, সোনার বোতাম...। প্যারাসুটের এক কোণে মিনমিনে রেশমি হরফে লেখা আছে: অলকা রায়। শুধু এই। কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই। ভালো ক'রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলুম। ডাঁটের ওপর সোনার জলে খুদে-খুদে ক'রে লেখা : মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। কোনও নম্বর দেওয়া নেই। পর দিন খবরের কাগজে-কাগজে আমার বিজ্ঞাপন বেরুল ছাতার মালিকের তলব ক'রে।...সে-দিনই সন্ধেবেলা ময়লা শার্ট পরা মোটা-রকমের মোদ্দাফরাস গোছের একটি লোক এসে হাজির। সারা গালে তার দাড়ি বিজবিজ কচ্চিল। শুয়োরকুচি চুল। চোয়াড়ে চেহারা। নোংরার একশেষ। গায়ে বোঁটকা গন্ধ। একটা বিড়ি টানতে-টানতে সে আমার গায়ের ওপর এসে বল্লে—ছাতাটা আমার।

ইজিপ্টের হিস্ট্রি পড়চিলুম।

পড়তে-পড়তে বল্লুম—তা হোতে পারে না।

লোকটা বল্লে—ছাতা চাই।

—কী জ্বালাতন!...

হিরের তালাসে হাত পেতে শেষে কী-না জিরে নিয়ে—

চ'টে বল্লুম—আপনার নাম কী?

—কালীকিঙ্কর কাকাটি

—আচ্ছা, ছাতাটা কেমন, বলুন তো

একটা টুলের ওপর কালীকিঙ্কর বসল।

বল্লে—সিল্কের প্যারাসুট—সোনার বোতাম—হাড়ের—

—কোনও নাম-টাম লেখা আছে?

—আজ্ঞে না।

—জোচ্চোরি করতে আসা হয়েছে?

লোকটা ফুলে ফোঁস ক'রে উঠল।

—জোচ্চোরি! আমার চোদ্দ পুরুষ কোনও দিন জোচ্চোরি ক'রে নি, মশাই।...ইস্, ভারি তো এক ছাতা! তিন দিন পরে পগার

কালীকিঙ্কর রেগে টং হয়ে উঠল।

বল্লুম—আপনি কড়ার-মতো জবাব দিতে পারলেই তো ছাতা আপনাকে দেওয়া যেত; নইলে তো মগের মুলুক

—তা বটে; কিন্তু আমার গিন্নি যা ব'লে দিয়েছেন, তার বেশি তো আমি আর কিছু জানি নে। তিনি তো নাম-টামের কথা কিছু বলেন নি।

দ'মে গেলুম—বড্ড। অলকা কি তবে এই লোকটার স্ত্রী! হা ভগবান! পঙ্কেও এমন মৃণাল জন্মে!

—আপনার স্ত্রীর ছাতা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি গাড়ি ক'রে এসেছেন আমার সঙ্গে

—বটে?

সেই মুখখানা আর-এক বার দেখবার দারুণ পিপাসা জেগে উঠল। বুকের ভেতর টগবগ করতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে বল্লুম—চলুন।

—হুঁ; আসুন। সেখানে গেলেই একটা মোকাবেলা হবে।

একখানা জমকালো ব্রুহামের পাশে সে নিয়ে আমাকে দাঁড় করালে। বাপ রে, পাটের দালালের পেটে এত! হতভম্ব হয়ে গেলুম। আঁধারের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলুম। কৈ, সে-মুখখানার নজির পাচ্চি না তো!

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লুম গাড়ির ভেতর এক বয়স্কাকে দেখে। কালীকিঙ্করের যোগ্যা বটে।

প্রৌঢ়া হেসে বল্লেন—আমার বোন এই ছাতাটা ফেলে গেছল, আপনি কুড়িয়ে রেখেছিলেন বুঝি?...হুঁ, আজকালকার দিনে—আজকালকার দিনে—আবার এ-সব ফিরে পাওয়া যায় না-কি! উ কি আর পাওয়া যেত?...যা আলাভোলা মেয়েটি গা!...ভাগ্যিস—আপনি...

খইনি টিপতে-টিপতে নাক মুখ খিঁচে বত্রিশ পাটি বের ক'রে বল্লেন—আপনার নিকট আমরা কী যে—। এই ছাতাটা বানাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।...এই দেখুন, কতখানি হিরে!...আমি ছাড়া আর কেউ এ-সব জানত না।

হাড়ের ডাঁটের ওপর ছোট্ট একখানা কালো পর্দা সরাতেই জ্বলজ্বল ক'রে এক খণ্ড হিরে জ্ব'লে উঠল।

—এ কেউ জানত না, কেউ না!...এ-ছাতা কোথায় থাকে, তা-ও কেউ জানে না—এমন আবডালে লুকিয়ে রাখা!...তা ওই আলাভোলা কাছাখোলা মেয়েটি কী ক'রে আবার গন্ধ পেলে গা!...এই বেলা হিরে সিন্দুকে তুলে রাখতে হবে।...

ও! ঠিক কথা; আপনি তা হোলে আমাদের বাড়িতে আসবেন। অলি—অলকা আপনাকে কফি খেতে নেমন্তন্ন করেচে।...

ব'লে খুব এক চোট হেসে আমার হাতে একখানা রকমারি লেফাপা তুলে দিলেন। তার ওপর মেয়েলি হাতে আমার নাম ধাম মেসের ঠিকানা অব্দি সবই লেখা ছিল।

এইখানে অলকা আমায় বাধা দিয়ে বল্লেন—হুঁ। এই রকম ক'রে বুঝি মা'র সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়! আমার বয়েস ছত্রিশ,—অমলার চোদ্দ।...এই বয়েসেই আমি বুড়িয়ে নেতিয়ে শুঁটকি মেরে গিয়েছিলুম!...

টাক-মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বল্লুম, হ্যাঁ রে...অমি...আবার গল্প শুরু হোল।...রাত তখন অনেক হয়ে গেছল। কোন এক কত পুরোনো রাতের কথা মনে প'ড়ে আমার দু'চোখ তিতে উঠল। অমলা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কোন মৃতার মুখ যেন আজ আবার এই জীয়ন্তের ভেতর মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

তার দিকে তাকাতে-তাকাতে সারাটা রাত আমি বিভোর হয়ে ব'সে রইলুম।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩০

শিরোনাম

কপিকার-নির্বাচিত

বিলাসী

বিলাসী বলছে গা বমিবমির জন্যও নয়—গর্ভের যন্ত্রণার জন্যও নয়—কিন্তু বিয়ের আগে যে-সব হাজার-হাজার পুরুষ আমি দেখেছি, তাদের ভিতর কয়েকটির কথা এই ছ' মাসের ভিতর অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে; তোমার বদলে তাদের যে-কেউ এসে আমাকে চাইলে আমি তাকে—খুব গভীর ভাবেই হয়তো—আমার সঙ্গে মিশতে দিতাম।

কিন্তু তুমি—তোমার কথা তুমিই জান।

কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের সকলকার—সব মানুষগুলোর পশু পাখি কীট ফড়িঙেরও—সব রকম জীবনের কথা আমি যত দূর চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছি ও ভেবে দেখেছি—ততই মনে হয়েছে যে ভগবান ব'লে এ-সৃষ্টিতে কেউ যদি থাকে তো সে ময়ূর ময়না হরিণ প্রজাপতির মতো সুন্দর জিনিসগুলোকেই শুধু ক্ষুধা দেয় নি, ক্ষুধার তৃপ্তি দেয় নি, ক্ষুধার সন্তান দেয় নি, অসুন্দর জন্তুকে মানুষকেও তেন্নি তার চেয়েও উগ্র ক্ষুধাই দিয়েছে—এমন-কি তার সেই ক্ষুধা মেটাবার জন্য সুন্দর-সুন্দর শরীরের যোগানও ভগবান দু' হাত ভ'রে দিয়েছে। সুন্দরকে নিয়ে নিষ্ঠুর রাক্ষসের মতো লুটেছে, অপচয় ক'রেছে, এই সবের থেকে উজাড় ক'রে দিয়েছে কুৎসিত ডিম—বীভৎস সন্তান বিকট জানোয়ার সব জন্মাবার জন্য; কোথাও বিবেক নেই যেন, কোনও বিচারই যেন নেই ; সুন্দরকে—আমাদের দেহের সৌন্দর্যের কথা—আমি সুন্দর আকর্ষণটার কথাই বলছি এখন; কিন্তু তাকিয়ে দেখো তো, ছুঁয়ে দেখো তো দেহের সৌন্দর্যের কী গভীর স্পর্শ

বিলাসী আগাগোড়া তার শাড়িটা খসিয়ে ফেলে ভানুর কোলের উপরে ব'সে বলছে : সুন্দরকে টুঙোমুণ্ডো ক'রে দিতে ভগবানই যখন কোনও বিবেকের কামড় খায় না—তখন আমাদের আর কী?—আজ থেকে তুমি আমাকে দিয়ে যত সন্তান চাও—তোমার মতো বিকৃত (...) চেহারার যত ছেলেপুলে পৃথিবীতে আনতে পার, এনো

আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই—

বধূর গলার ভিতর কোনও বিরক্তিও নেই।

না আছে তার একটি রোমের ভিতরেও একটুকুও বিদ্রোহ।

ভগবানও কোথাও ব'সে থেকে কাউকে কিছু মানা করছে না।

কিন্তু নিজে সে কুৎসিত বা বীভৎস কিছু না হ'লেও ভানুর সমস্ত বিবাহিত জীবন তাকে বাধা দিচ্ছে।

সে কবি; থিয়েটারের কবি নয়; মেলোড্রামারও না; বত্রিশ বছর ধ'রে একটু-একটু ক'রে জীবনকে বুঝে—সত্যকে জমিয়ে কবি সে; গত ছ' মাস ধ'রে অনেক সত্যকে সংরক্ষণ ক'রেছে সে, জীবনটাকে আরও অনেকখানি অনুভব ক'রেছে।

কেউ মা হতে যাচ্ছে না; কেউ পিতা হতে যাচ্ছে না; অন্ততঃ আজ রাতে তো কিছুতেই নয়।

কোনও সুন্দর সফল পুরুষের হাতে আজ রাতে কিম্বা কোনও রাতেই, কারণ তেমন পুরুষ কোথায় পাবে সে? বিলাসীকে ছেড়ে দিতে না গেলেও তার কথার সত্য ভানুর কাছে নতুন কিছু উদ্ঘাটন ক'রেছে বটে—পুরোনো কিছু আজকের রাতের মতো নতুন ক'রে।

বিবাহের জীবনটা এই রকম ধাক্কারই বটে; হয়তো সমস্ত জীবন ব'সেই ঘ্যাড়ঘ্যাড়ানির আর শেষ থাকবে না—

কিন্তু তাই ব'লে জীবন—বিবাহের জীবনও বিফল নয়; বিলাসীকে না পেলে এই ছ' মাসের অভিজ্ঞতাগুলোকে কোথার থেকে সে পেত? এই মুহূর্তের-পর-মুহূর্তের অভিজ্ঞতাগুলো জীবনকে আরও অনুভূতি দেয় নি কি? আরও বোধ? আরও গভীরতা? সব-চেয়ে বড়ো আকাশও যেমন আরও আকাশে গিয়ে নিস্তার পায়, তেম্নি এক নিস্তার?

জীবনটা এই সব অভিজ্ঞতার জন্য অনুভূতির জন্য, এই সব আগ্রহের জন্য আন্তরিকতার জন্য—এই সব নতুন সত্যের জন্য; লালসা খোঁচা ক্ষুধা ঠাট্টা নিষ্ঠুরতা শূন্যতা অবিবেক অবিচার—নক্ষত্র ও কাদার ভিতরে-ভিতরে ডুব দিয়ে জানবার জন্য—বুঝবার জন্য এই জীবন?

বিয়ের পরে মানুষ জীবনটাকে আরও ঢের বেশি ক'রে বুঝবার সুবিধা পায় : লোচ্চামি ভালোবাসা পরামর্শ দয়া সঙ্গ বন্ধুত্ব—বধূ যদি তোমাকে কিছু না-ও দেয়, —প্রতি মুহূর্ত তবু তোমার জীবনের সঙ্গে ঘষা খেয়েই একটা নতুন চমক দিয়ে যাচ্ছে যেন: হাজার-হাজার বছর পরে জীবন যদি কোথাও বেঁচে থাকে, তাহ'লে তার অগাধ অভিজ্ঞতার ভিতরে এর প্রতিটি ফুলকিরই একটা জায়গা হবে।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩০
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত

অপূর্ব

এখন?

হেমন্ত চলেছে।

ঘুমটা শেষ রাতেও ভাঙল না; কিন্তু এখনও ঠিক ভোর হয় নি—ভোর হয় নি। গোলমাল বড্ড—পাশের বাড়িতে হয়তো চলেছে; চলুক; কার কী আসে যায় তাতে!

কলকাতা,—১৯৩০।

কলকাতায় ১৯৩০ ফুরিয়ে আসছে।

অনেক দিন পরে এই আবার কলকাতায় আসা।

স্টিমারেই শীত খিঁচে ধরতে চেয়েছিল বটে, কখন কী ক'রে যে গায়ের সমস্ত চামড়াটা সে ফাটিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে—স্টিমারেই হয়তো—হয়তো কলকাতায়।

কিন্তু চামড়া ফাটা—এ এক নতুন জিনিস ; কালকা সিমলায় শীতেও যার কিছু হয় নি। মানুষটা বুড়ো হতে চলেছে?

কালকা আর সিমলা—ও-সব বড়ো-বড়ো নামই শুধু; কুলি হয়েও সেখানে যেতে পারা যায়। কিন্তু রক্তের ভেতর একটু রাজার ধাত না থাকলে কেউ কি সারা রাত ভ'রে এমন ঘুমটাই ঘুমতে পারে।

কিন্তু তবুও—দম ফুরিয়ে গেছে—সমস্ত পৃথিবীটাই (শীত নয়—সকালের সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার জাদুর শীত ফুরিয়ে গেছে) এই আবার বিঁধতে শুরু করেছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অপূর্ব ভাবছে, 'তবু, পুরুষ মানুষ তো—'

কথাটা সে মেয়েদের কাছ থেকেই মাঝে-মাঝে শুনেছে—তার মা'র কাছে। খুড়তুতো বোনের কাছে তার,—তারপর আরও কোথায় কত জায়গায়—

না জানি সে-জীবনের কত কুয়াশার ভেতর থেকে দু'-একটি কারা—মেয়েমানুষ?—তাকে পুরুষমানুষের মতো দেখতে চেয়েছে।

তা চেয়েছে বটে, কিন্তু কুজ্ঝটিকার ভিতর কোথায় তারা গিয়েছে স'রে। তাদের প্রত্যেকেরই পুরুষমানুষ র'য়ে গেছে।

তার স্টেজের ওপর অপূর্বকে কেমন দেখাচ্ছে—লোদীর মতো, ঘোরীর মতো, না ফলস্টাফের মতো সে-সব দেখবার জন্য একটিও লোক আজ আর নেই।

অপূর্ব ভাবছে, জীবনটা যদি স্টেজে দাঁড়িয়ে দেখে যে তার জন্য কোনও থিয়েটার নেই, থিয়েট্রিক্যালিটি নেই, স্টেজে দাঁড়াবার কোনও দরকারই ছিল না তার, একটা ভূত অব্দি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যার সঙ্গে কথা ব'লে তাকে বুঝতে দিতে পারা যায় যে অপূর্ব কেমন স্ট্যালিনের মতো, কিম্বা সোভিয়েটদের মতো, কিম্বা কেমন বোহেমিয়ান সে—হাতে তার স্ট্রাইন্ডবার্গের মতো কেমন কী এক কলম, কিম্বা গ্যয়টের মতো বোধের কী এক সাধুতা তার মাথার ভিতর, হ্যর্থারের মতো সারা জীবন (ত্রিশ বছর ধ'রে) কত কষ্ট পেয়েছে সে, কিন্তু হ্যর্থারের সেন্টিমেন্টালিজমকে যে দিয়েছে শেষ ক'রে, হ্যর্থারের মতো যে তার কষ্টের কোনও রেকর্ড রাখতে যায় নি। (সে-সব রেকর্ডের শেষ কোথায়?) ক্রিসতেপের মতো মেয়েমানুষের থেকে মেয়েমানুষের স্বাদ নিয়ে যে ফেরে নি, কিন্তু এক-আধ জন মেয়েমানুষকে নিয়েই মেয়েমানুষকে বুঝেছে যে, যার মাথার ভিতর মাংস-পিপাসার কৃমির চেয়েও বোধের একটা অকপটতাই রয়েছে ঢের বেশি, পৃথিবীর বড়ো মানুষদের—বার্নার্ড শ' ইত্যাদিকে যে কিছুতেই একটা-একটা বড়ো-বড়ো থিয়েটারের স্টার ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছে না—পৃথিবীতে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা কিংবা—আবার সেই কথা—বোধের সাধুতা যে খুবই কম দেখতে পাচ্ছে—এই সব কথা এবং এমনি ধরনের আরও অনেক কথা—আজও সে অনেকটা নরম রয়েছে ব'লে—একটা ভূতকেও অন্তত বলতে চায়। তারপর যখন সে আরও কঠিন হয়ে উঠবে—থাক অন্ধকার হয়ে তার সমস্ত স্টেজ; জীবনের তার সমস্ত থিয়েটারটাই শূন্য প'ড়ে থাক, মানুষের একটা নিতান্তই অগ্রাহ্য কথা বা চিঠি বা কলমের খোঁচা বা আরও অনেক অনর্থক জিনিস নিয়ে পৃথিবীর টেলিগ্রামগুলো কী রকম হুজুক ও থিয়েটার তৈরি করছে, করতে পারে, অভিনেতারাও কতটা আত্মপ্রসাদ পায় তাতে,—সে-সব ভাববার সময় তখন হয়তো তার আর থাকবে না।

কিন্তু, আজও সে ছোটই তো; ত্রিশ বছর আর ক'টা বছর। আজও তার বুকের ভিতর মোচড়ের সময় রয়েছে; দিন আজও নরম; কঠিনতার দিকে চলেছে বটে, কিন্তু হেমন্তের রোদ আজও; গায়ের থেকে তার ফসলের শিশির আজও শুকোচ্ছে না।

আজও কষ্টের রেকর্ড কলমের থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়; আজও নিজেকে মাঝে-মাঝে রোম্যান্টিক ব'লে মনে হয়—বোহেমিয়ান ব'লে; আজও দু'-চারটে বিশ্বাস কিছুতেই শেষ হয়ে যেতে চায় না; না জানি কোথাকার কোন জিনিসগুলোর সঙ্গে চোখঠার দিয়ে খেলা করতে-করতে মাথাটা আজও লজ্জা পেতে-পেতে তবুও লজ্জা পেতে চায় না;—মাথাটা; মেয়েমানুষ কোথাও নেই; সে থাকলেও কোথাও কারু কিছু হত কি? অপূর্ব কী তাকে খুব ভালো ক'রে জানে না?

কিন্তু তবু—কোনও এক মেয়েমানুষের কাছেই সে তার পুরুষমানুষ হতে চায়।

একটা স্টেজ চায়—খুবই ছোট; এক জন মেয়েমানুষকে নিয়ে শুধু। সারা রাত সে যে থার্ড ক্লাসের নীচের ডেকে খুলনার স্টিমারে—সেই একঘেয়ে স্টিমারটায়, জীবনের ত্রিশ বছর ভ'রে এই স্টিমারের খোলটার মতো রক্তমাংসের সঙ্গে আর একটা জিনিসকে সে মিশিয়ে নিতে পেরেছে?—নদীর শীত ও অন্ধকারের ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে জীবনের অন্ধকার শীতের সুতো টেনে এনে তবুও এক-আধটা রঙের পোঁচড়ের চেষ্টায় ছিল—অপূর্ব চায় : কেউ তা যদি বুঝত। সারাটা রাত সে যে স্টিমারে ব'সে ছিল—কেউ যদি সারাটা রাত ধ'রে (হোক না সে মাঠের গাঁয়েরই কেউ) বুঝতে চেষ্টা করত যে জীবনে যে পৃথিবীর হাড্ডিটা ধরতে পারে নি, স্টিমারে ব'সেও সারা রাতই সে তা পারছে না মোটেই যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু তবুও কিছু না পেয়েও পৃথিবীর হাজার-হাজার মানুষদের মতো (পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের মতো নয় অবিশ্যি) এই জীবনটাকে যে তাকে কেমন এক রকম ক'রে চালিয়ে নিতে হচ্ছে, সেই জন্য যে তাকে কত ধন্যবাদ দিতে হয়, সে যে কত একা, সমস্ত অভিনয়ের থেকে সকল চোখের থেকে সে যে কত বাইরে,—অন্ধকার শীতের নদীর কিনারে একটা পোকার মতো গুটি পাকিয়ে-পাকিয়ে জীবনটা যে তার কাউকেই দেখাচ্ছে না, কিন্তু তবুও দেখতে গেলে পৃথিবীর লাইমলাইট অনেক ক্ষণ ধ'রেই এর উপরই ফেলবার কত যে দরকার রয়েছে—এই সব—কেউ যদি এই সব সারা রাত ধ'রে অপূর্বর সম্বন্ধে এক বার ভেবে দেখতে যেত।

আজ এই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বাজারের পচা মেসের সমস্ত গরদার এক কিনারে যত কথা ভাবছে সে, যা কিছু দেখছে, যা কিছু বুঝছে—তার জীবনের এই হিরোইক ট্র্যাজেডির মামুলি মাল-মশলার সম্পূর্ণ অভাব তবুও যদি কারু কাছে হিরোইক ব'লেই (হিরোইকই তো তা) মনে হয়—এমন এক জন লোক যদি কোথাও থাকত!

কিন্তু নেই কেউ—কোথাও কেউ নেই; কেউ নেই।

এ-রকম সব বোধ কার আর রয়েছে? যার রয়েছে—যাদের,—অপূর্ব তাদের কাছে কিছু নয়। অপূর্ব তার নিজের কাছেই শুধু কিছু; তার নিজের মনের ভূতের কাছে; যদি তার একটা কলম থাকত তার কাছে—

পৃথিবী এ-সব লোকের কোনও খোঁজ-খবর নেয় না।

এদের জীবন কলমে ফ'লে উঠতে পারছে না ব'লে—কিম্বা কথায়—বা কাজে—জীবনের জন্য কোনও থিয়েটার থাকছে না; এক-একটা আশ্চর্য গল্প পাণ্ডুলিপিতেই উঠছে না—কিম্বা প্রপ্যাগান্ডার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিড়ি ফুঁকতে পারা যায় না; গোল্ডেন বর্মা চুরুট বড্ড কড়া ব'লে মনে হয়েছে। আগে-আগে কলকাতায় এসে—দেশের বাড়িতে থাকতে কিছু না—সিগারেট খাবার অভ্যাস ছিল। তামাক জিনিসটা পাতলা রকমেই চলে।

কিন্তু উনিশ শো তিরিশের সালে এখানে সিগারেট ভেল্কির মতো উড়ে-পুড়ে গিয়েছে। দেশে থাকতেই অপূর্ব তা বুঝেছিল। কলকাতায় এসে দু'-এক দিনের মধ্যেই

বুঝতে পেরেছে সে যে বাঙালি তার জীবনে একটা কাজে অন্তত হাত দিতে পেরেছে—হাত দিয়ে শেষ করতে পেরেছে—

থাক,—তার ভিতর যত শান্তি ও সান্ত্বনাই পোরা থাকুক না কেন—(নিজেকে যখনই বড্ড নিচ ঠাণ্ডা নোংরা ব'লে মনে হয়েছে, তখনই) জীবনের থেকে এই আর একটা জিনিস চ'লে যাক।

অপূর্ব এখনও মাইল্ড চুরুটের মুরোদ বোঝে নি—কার দেখাদেখি একটা গোল্ডেন কিনে বসেছিল। চুরুটটা টানতে-টানতে কখন এক সময় হাত পা ছেড়ে দিয়ে সে যেন চ'লে যাচ্ছিল (তার খাট শুদ্ধ) কোন এক অজ্ঞানের ভিতর—হয়তো মৃত্যুর অজ্ঞানের মধ্যেই।

তারপর, জীবনটা যদি ওই রকম ক'রেই শেষ হয়ে যেত; প্রায় সকল মানুষেরই ওই রকম ক'রেই যায় কি-না—কাজেই হয়তো ঢোঁক চেপে ঘুমিয়ে পড়তে পারা যায়।

কিন্তু তবুও একটা অসহিষ্ণুতা থেকে যেত যেন; মনে হত যেন মানুষ শীতের মধ্যে কী বরাবর থাকত? অন্ধকারের মধ্যে? বরাবরই একা? অভিনয় করবার একটু সময়ও কী সে পেত না? শ' বা চার্চিল—কিম্বা—আর কার নাম বলা যায়?—তাদের মতন অত অভব্য রকমের থিয়েট্রিক্যাল না হলেও—দোতলার পার্টিশনের এ-দিকের ঘর ক'খানা নিয়ে কিম্বা এদিকে-ওদিকে কোনও দিনই কি একটা ফররা-ফ্যাঁকড়া জুটত না? কিছুই কি লিখতে পারা যেত না? পাওয়া যেত না কি খানিকটা—এক জন অন্তত (জাঁ ক্রিসতেপ বা সলোমনের মতো অত কিছু নয়; ছেলেমানুষ ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে—সে অনেক চায়; মানুষ রগে-রগে আস্বাদ ক'রে নিতে চায়—অল্পেতেই তার পাহাড় হয়ে ওঠে) মেয়েমানুষ?

যখনই মৃত্যুর ঘুমের কথা ভেবেছে সে—এখন নয়, আর একটু পরে যেন সে আসে : মনে হয়েছে অপূর্বর।

আর একটু পরে—যখন তার অভিনয়ের আশ মিটে গেছে, ছোট-খাট স্টেজটা ভেঙে গেছে তার, তার শখের কথাগুলো যত দিন শূন্যে লাইন পাকিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেজে যেতে পারে, সে যতটুকু দূরেই হোক না কেন, ওয়্যারলেসের মতো গিয়ে ধাক্কা দিতে পারে, তার শেষ চেষ্টা ক'রে গিয়েছে যখন সে;—যখন তার মেয়েমানুষকে নিয়ে সে যে-ক'টা বৈঠকের যত ছেঁড়া-হেঁচড়ার ভিতর দিয়েই হোক না কেন, তবুও অনেক কিছুই হ'ল।

হয়তো কিছুই হবে না।

কিন্তু মৃত্যুর আগে যদি এইটুকু সব অন্তত হত?

চুরুটটা খানিক খাওয়া—বিছানায় প'ড়ে ছিল। গন্ধ সহ্য করা যায় না। তবুও ফেলে দিতে পারা যায় না—পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে। আজকাল পয়সার দাম বড্ড (অনেক দিন আগেই জোসেফ চেম্বারলেন বলেছিল : "Tariff"—কিন্তু সে-হিসেবে মোটেই নয়—)। টেবিলের উপর গিয়ে সেটাকে রেখে দিতেই ঘুমের চটকা ভেঙে গেল।

এর পর অপূর্ব ল্যাভেটরির দিকে যাচ্ছে।

ফিরে এসে ঘুম আর হয় না; তবুও বিছানায়ই শোয়া যাক—একেবারে লেপের ভিতরে ঢুকে প'ড়ে।

এখন ভাববার সময়।

কে জানে কলকাতার রাত কখন শুরু হয়, কখন যায় শেষ হয়ে? ট্রাম-বাস কখন থামে, কখন ফের চলতে আরম্ভ করে? বড়ো রাস্তার কাছে খানসামার লেনের মেসের ঘরগুলো কাঁপছে শুধু—হেমন্তের শীতে? লরির চাকার গুঁতোয়? না অপূর্বকে সারা রাত বুকে রাখতে হয়েছে ব'লে? এমন নড়বড়ে জীবন এই মেসের ঘরগুলোও কি কোনও দিন দেখে নি?

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩০
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত

[illegible]

রাত প্রায় বারোটার সময় ~~[illegible]~~

কলকাতায় এই আমার প্রথম আসা। স্টেশনে ~~[illegible]~~ গাড়ী প্রায় সাতটার সময় এসেছিল। সঙ্গে আনা শুধু একটা ছোট পুঁটলি। একারণেই এ আরামে এলে নিতে পারা যেত; কিন্তু ঘুম [illegible] তাকে ভেবেছিলুম। হাওড়ায় প্রথম নেমেই ভয় পেয়েছিলুম এত কুলী আর গাড়ী দেখে। সবাই সবার মাথায় মোট চাপিয়ে দিচ্ছে। ভাবলুম ঠাট করে টিকিট দেবার নিয়ম নেই বুঝি। কত যে গাড়ী-ঘোড়া! [illegible] আর হাট-বাট!

আমার পাশে কাকে যে একটু তাকাবার সময় নেই, সবার পাশে বেশ ঘাড় তাকিয়ে আছি।

"কুলীগুলো — বাপ রে কথার মত কোথা কি হয়, তাদের দেখে-শুনে শুধু গরম নিশ্বাস আর শীত ভোগা দেখে আমি তো [illegible] গেলুম। [illegible] হাওয়ায় মোট তুলতে কি করে সইছে সেই। [illegible] একেবারে গাড়ী দেখলুম। একজন বল্লে—"এই ট্যাক্সি ওয়ালা ঘোড়া হবে। ওদিকে তাকিয়ে যে গাড়ীগুলো দেখলুম তুললুম ওগুলোকে ট্যাক্সি বলে। ট্রামের নাম আগেই শুনেছি। দূরে তাকিয়ে দেখলুম রাস্তায় ট্রাম যাচ্ছে যেতে পেলাম। [illegible] বলে বলে আমার মনে হোল—তারই রাস্তায় কি করে নাবতে একেবারে নিচে যেতে হবে যে'

রাত প্রায় বারোটার সময়

রাত প্রায় বারোটার সময় রিকশ'তে চড়লুম।

কলকাতায় এই আমার প্রথম আসা। স্টেশনে অনেক ক্ষণ বসেছিলুম। গাড়ি প্রায় ন'টার সময় এসেছিল। সঙ্গে আমার শুধু একটা ছোট পুঁটুলি। এক হাতেই তা অনায়াসে তুলে নিতে পারা যেত। তবুও কুলি ডাকব ডাকব ভেবেছিলুম।...হাওড়ায় প্রথম নেমেই ভড়কে গেছলুম এত কুলি আর পুলিশ দেখে।...সবাই মজুরের মাথায় মোট চাপিয়ে দিচ্চে। ভাবলুম হাতে ক'রে জিনিস নেবার নিয়ম নেই বুঝি।...কত যে হল্লা— হিড়িক্কি!...মার-মার কাট-কাট!...

আমার পানে কারু বড়ো একটা তাকাবার সময় নেই, সবার পানেই যেন আমি তাকিয়ে আছি।

কুলিগুলো কালো কয়লার মতো হোলে কী হয়, তাদের সেই তাজা-তাজা গরম হিন্দি আর নীল কোর্তা দেখে আমি ভড়কে গেলুম।...তাদের আবার মাথায় মোট তুলতে কী ক'রে হুকুম দেই?...কতকগুলো রকমারি গাড়ি দেখলুম। এক জন বল্লে : 'এই ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া হবে?' সে-দিকে তাকিয়ে যে-গাড়িগুলো দেখলুম, বুঝলুম সেগুলোকে ট্যাক্সি বলে। ট্রামের নাম আগেই শুনেছি। দূরে তাকিয়ে দেখলুম, রাস্তাটা ট্রাম আর মোটরে গাদা। স্টেশনে ব'সে-ব'সে আমার মনে হোল : বাবা, ওই রাস্তায় কী ক'রে নাববো! একেবারে পিষে যেতে হবে যে! ভাবলুম কলকাতায় হাজার-হাজার লোকই বুঝি এন্নি নিত্যি গুঁড়ো হয়ে যায়। মনে ভারি ভয় হোল। রাস্তার দিকে আবার তাকালুম। মনে হোল পিঁপড়ের মতো মানুষগুলোকে মাড়িয়ে কলের চাকা হা-হা ক'রে ছুটচে, অথচ কারু যেন সে-দিকে নজরই নেই। বুক শিউরে উঠল।...এ আবার কেমন ঠাঁই। বাড়ির কথা মনে পড়ল। শাশুড়ির সঙ্গে রাগ ক'রে চ'লে এসেছি। কোনও দিন তাঁর গালাগাল পাড়াপাড়িতে টু-শব্দও করি নি।...কত-কত মাঘ-পোষের রাতে একটা-দু'টো অব্দি জেগে ওই কামেশ্বরী দিঘিতে গিয়ে বাসন মেজেছি, কাপড় ধুয়েছি, সেলাই-ফোঁড় করেছি বস্তা-বস্তা কাঁথা, জাল বুনেছি, ঘরদোর পরিষ্কার করেছি, উঠোন নিকিয়েছি, আলপনা কেটেছি,—সবই এক জনের দরদে!...যিনি আমার স্বামী, ইনি

তাঁরই মা। স্বামীকে আমি ভালোবাসি। কাজেই তাঁর মা আমারই মা। তাঁর জন্য আমি সবই সইব।

কিন্তু সেই যে পনের দিনের কথা ব'লে আট মাস হোল স্বামী কলকাতায় চ'লে গেছেন, কৈ তিনি তো আর ফিরলেন না! একখানা চিঠিও দিলেন না। রোজ ভোরেই তাঁরই মুখের অপেক্ষায় চেয়ে থাকতুম, অনেক রাত অব্দি দোর খুলে রাখতুম।...প্রথমটা শাশুড়ির মুখনাড়া গায়ে তুলতুম না। কিন্তু স্বামী যখন আর এলেন না, তখন মনে হোল পাওনা মিল্লে দেনা দেওয়া যায়। কিন্তু বকেয়া যদি এত প'ড়ে থাকে,—উশুল ক'রে যদি একটুও যুৎ করতে না পারি, তাহ'লে দেউলিয়া হব যে! আমি পড়াশুনা অনেক করেছিলুম। অবিশ্যি ইস্কুলে নয়। তাই মনে আমার কেমন একটা ধাঁধা বেঁধে যেত অনেক জিনিস নিয়েই। স্বামীকে আমি কতখানি ভালোবাসতুম। আর তিনি কী না আমার পানে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। এটা কি ঠিক হচ্চে?...

শীতের ভোর। একেবারে পোষের মাঝামাঝি। চারটের সময় উঠেই উঠোন ঝেঁটে, গোবরজল নিংড়িয়ে ঘরদোর নিকিয়ে নিচ্চিলুম। আমাদের বড়ো গেরস্তর বাড়ি। চার-পাঁচখানা আটচালা। সবগুলোই ফি-রোজ নিকোতে হবে, ঘরদোর ঝকঝকে খটখটে রাখতে হবে। কোথাও খড়কুটোর টুকরো প'ড়ে থাকতে দেখলে শাশুড়ি রেগে টং হয়ে যেতেন।...তাঁর ভারি ছোঁয়াছানার বাচবিচার ছিল, নোংরা জিনিস দেখতে পারতেন না। ধবধবে কাপড়চোপড় তাঁর আটপৌরে।... এক দিক দিয়ে মন্দ নয়। কিন্তু যার দৌলতে এত পোশাকিপনা চলচে, তাকে একটা মিষ্টি কথা শোনালে মুখ খ'সে যায় না।

শাশুড়ি তখন ঘুমের থেকে উঠে আহ্নিক সেরে মোটা থানের কাঁথাখানা জড়িয়ে রোদের মুখে এসে বসলেন।...

—বলি, ও নতুন বৌ, পরনে ওটা কী কানি রে, মাগী!

চুপ ক'রে রইলুম।

—বলি, কতা শুনছিস না, ভাতারখাগী!

নিকিয়ে যেতে লাগলুম।

—হারামজাদি, হারামি, পুজোর ঘর নিকোচ্চিস ওই খাটের কানি প'রে! বেল্লিক, তোকে ঝেঁটিয়ে

কপালের থেকে উস্কখুস্ক চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে বল্লুম—কাপড় দিয়ে তো আমি আর ঘর লিপচি না, মা

কথা শেষ করতে দিলেন না।

বল্লেন—পোড়ারমুখীর ক' পাটি দাঁত আছে গুণে নেব—খ্যাংরা মেরে...এন্নি সব অনেক চল্ল।...

ধীরে-ধীরে গোবরজলের বালতিটা সরিয়ে ঘাটের থেকে হাত-পা ধুয়ে এলুম। পেটরায় দু'খানা সাফ কাপড় ছিল, তারই একখানা প'রে ঘর লিপতে গেলুম।

—যা, যা, নিকোতে হবে না, ক্ষ্যামা দে, ক্ষ্যামা দে; তোর হাত দিয়ে আমি পুজোর-ঘর মাড়াব না—

—কেন, মা, পরিষ্কার হয়ে এসেছি তো—

—ঠাকুরদেবতার সঙ্গে বজ্জাতি! অ্যাঁ!... তোদের চোদ্দ গুষ্টি ওলাওঠা...তোরা আবার ঠাকুরঘর লিপবি কী রে!..

এ-ও গেলা হোল। চোখ বুজে বল্লুম—প্রায়শ্চিত্তি করতে হবে তো—।

—যে-অঘটনটা করলি, আগে তার ফলভোগ কর গে যা; এই ঘরটা ও-পাড়ার বামাপিসিকে দিয়ে নিকোব। ঠাকুর-ঘর তোর আর লিপতে হবে না।

পুজোর-ঘরটা আমি সব-শেষে লিপতুম। ওটা নিকোবার একটা রীতিমত লোভ ছিল আমার। রোজ ভোরে কয়েকটা দণ্ড ওখানে ব'সে বড়ো শান্তি পেতুম।...চারটে ঘর লিপতে আমার যা সময় লাগত, এই একখানা লিপতেও ঠিত তা-ই লাগত।...সে-জন্যে সারা গায়ে কথার ফোস্কা জ্বালিয়েও আমি আরাম পেতুম।...মায়ের মা যিনি, তাঁরই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকতুম—আর দু' চোখ আমার জলে ভ'রে উঠত। মায়ের কাছে কত-না মানত করতুম...

স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও, জগজ্জননী; তুমি তো সবই পার, মা,—সৃষ্টি স্থিতি তোমার হাতে। আমি এক জন নববধূ,—সন্তানের জননী হতে যাচ্চি।...আমার স্বামীকে তুমি কোথায় আগলে রাখলে, মা,—আমি যে তাঁকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি—ঘর নিকোনো শেষ হোলে বেলপাতা আর জবাফুল মা'র চরণ ভ'রে ঢেলে আসতুম। কেমন একটা মৃদু বাতাস তখন আমার কপাল ছুঁয়ে যেত। একটা শান্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আমার বুক ভ'রে উঠত। শাশুড়ি এ-সব বড়ো একটা দেখতেন না, ঠাকুর-ঘরটা কোনও দিন তিনি মাড়ানও নি। তবু রক্ষে। নইলে মায়ের পুজো আমি কচ্চি দেখলে আমাকে আর আস্ত রাখতেন না।...

আজ আমার বড্ড কান্না পাচ্চিল। আমি এত কী অপরাধ করেছি যে, দেবতার পায়ে প্রায়শ্চিত্তও করতে পারব না!

আমি আমার বাক্স-পেটরা গোছাতে লাগলুম। শাশুড়ি বামাপিসিদের বাড়ি বা ওন্নি কোথাও চ'লে গিয়েছিলেন। ঘরদোর বন্ধ ক'রে, দেবতার পায়ে এক বার প্রাণ ভ'রে ফুল-জল নিবেদন ক'রে, গোরুগুলোকে খড়বিচালি দিয়ে, সরলা গাইটার দিকে জন্মের মতো এক বার তাকিয়ে নিয়ে আমি আমার বিছানাটুকু দু'টো কাপড় আর গোটা-চারেক টাকা নিয়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। জানতুম, স্বামী কলকাতায়। কলকাতা যে কত বড়ো জায়গা,—মানুষের ঠিকানা জানলেও যে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না,—সেখানে ম'রে পচলেও যে কেউ কারু খবর নেয় না—অত কথা তখন জানতুম না।...জানলেও আমাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারত না। মরণের ভয় আমার ছিল না। কলকাতায় আমার স্বামী আছেন,—মা গঙ্গা আছেন। দু'টির একটিকে তো পাবই।...

আমি গাড়িতে চাপলুম। কিন্তু একটা কথা মনে প'ড়ে বুকের ভেতর হঠাৎ চন ক'রে

উঠল। আমি না হয় দশ বার মরব। কিন্তু আমার সন্তান!...সন্তান!...তাই তো!...তাকে হত্যা করবার ক্ষমতা আমার নেই তো। আমার তখন নয় মাস।...পেট খুব ভারি হয়ে গেছে। যখন-তখন ছেলে হতে পারে।...ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।...গাড়িতে কত লোক উঠলো। সবাই কেবল আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসতে লাগল, আর যা বলতে লাগল, তা আমি খানিকটা ধরতে পারলুম, খানিকটা পারলুম না।

যা বুঝলুম, তা ব'লে দরকার কী?

মানুষগুলো কী এম্নি!...

হাওড়ায় ঢের কুলি এসে জুটল। মোট তুলবার জন্যে হাঁকাহাঁকি করলে। কাউকে দিলুম না। কতকগুলো ভদ্র ছোকরা সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে আমার পানে গিলে তাকাতে লাগল। গোরা পল্টনগুলো শিস দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে আড়চোখে আমার পানে তাকিয়ে যেতে লাগল।...আমি ঘাড় নীচু ক'রে রইলাম। চার দিকে কতগুলো ইতর এসে জমল।...

এক জন বল্ল—চিৎপুরে থাক?...আরও কত কী বল্লে, মানে বুঝলুম না।

আর-এক জন গলা ফুলিয়ে চাকের মতো আওয়াজ ক'রে বল্লে—ওকে আমি খালপাড়ে দেখেছি। দোতলা বাড়ি নিয়ে আছে। নাম ফিরোজা। গাইতে পারে ভালো।

অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকাতে লাগলুম।

এক জন আমাকে শালপাতার ঠোঙায় ক'রে পাকা পিয়াল দিলে।...এক জন দু'টো বিড়ি নিয়ে সাধলে।

আর এক জন আমার কোলের উপর একটা সিগারেট ফেলে দিলে।...সবই সরিয়ে রাখলুম।...

বল্লে—ছোঃ!...কে যেন বল্লে...

একটা হাসির রোল প'ড়ে গেল।

এক জন বল্লে—হাঁড়ি হয়ে থাকতে হয় না, বিবি, অমন সুন্দর মুখ!

তাকিয়ে দেখলুম, মুসলমান। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

রহিম আর করিম বচসা করতে লাগল।...

চার দিকে গর্‌রা প'ড়ে গেল। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় শোয়াস বন্ধ হবার জোগাড়।

এম্নি সময় সেই মুসলমানটি বল্লে—চলো, বিবি, হালিমের নৌকোয়—হুগলির—

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই কতকগুলো মাড়োয়ারি তেরিয়া হয়ে এল।...একটা মারামারির জোগাড়।

দু'-চার জন পুলিশ এল, ভিড়টা ঠেলেঠুলে জায়গাটা সাফাই ক'রে দিল। যে-লোকটা বলেছিল আমার নাম ফিরোজা—সে শুধু একা ঘাঁটি আগলে রইল। মনে হোল যেন ওৎ পেতে আছে। খানিক ক্ষণ পরে আমার পায়ের তলে গড়িয়ে প'ড়ে

আবোলতাবোল ব'কে যেতে লাগল। কথায়-কথায় জিভ এলিয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে বিদ্‌ঘুটে গন্ধ—বোধ হয়, মদ খেয়েছে।...

ভাবলুম, মরবার সময় এসেছে।...

মনে পড়ল সেই শিশুর কথা, যে জন্মাবে।

তারপর তার বাপের কথা।

মনে ভরসা এল। উঠে দাঁড়ালুম। সবাইকে *ঠেলেঠুলে* চল্লুম।

আমার পিছু-পিছু কেউ আর বড়ো একটা এল না।...

কুলি-মজুর তখন সব প্রায় চ'লে গেছে। একটা ঠেলাগাড়ি, অনেকগুলো ঠেলাগাড়ি দেখতে পেলুম।...ভাবলুম, একটায় চড়া যাক। যে-দিকে চোখ যায়, চলব। সমস্ত শহরতলি পাতিপাতি ক'রে ঘুরব। যে দেখা দেয় না, তাকে পাবার জন্য।

মানুষে গাড়ি টানে।

গাড়িওয়ালার মুখে শুনলুম, ও-গাড়িগুলোর নাম রিকশ'। চড়লুম যখন, তখন রাত প্রায় বারোটা।...গাড়িওয়ালা লোকটাকে খুব ভালো ব'লে মনে হোল। সে-ই আমাকে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে তার গাড়িতে তুলে নিয়েছে। দরদাম করে নি। লোকটার দিকে এক বার তাকাবারও অপসর পাই নি;এন্নি ভেস্তে গেছলুম। মনে হোল—কেন যে, বলতে পারি নে—তবুও মনে হোল—বড্ড সহায় জুটেছে। এর চেয়ে বড়ো আশ্রয় যেন নেই।

ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে গেল।

শহরের গোলমাল উৎরিয়ে সে আমায় গঙ্গার ধারে নিয়ে গেল।...আকাশভরা তারা। গঙ্গার জল ঝিলমিল ক'রে ব'য়ে যাচ্চে। মৃদু হাওয়ায় নাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।...কোথায় যাচ্চি, জানি নে—জানতে চাই নে। মনে হোতে লাগল, লোকটা আমার মনের ঠিকানা জানতে পেরেচে। আমাকে কিছু সুধোলে না তো সে।

আমি যা জানি নে, সে তা জানে।

আমাকে নিয়ে সে অনবরত ছুটে যেতে লাগল।

কত গাছপালা—বনের কিনার। দিয়ে আমাদের গাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে উড়ে চলতে লাগল। কোথায় কলকাতার হাটহদ্দ—ধাপ্পাধড়াক্কা—মোটা-মোটা রাস্তাগুলো সরু হয়ে আসচে, চারিদিকে বন ঘিরে আসচে;নদীতে নৌকোর প্রদীপ মিটমিট কচ্চে—দূরে-দূরে শেয়াল-শুকনির ডাক।

আমায় নিয়ে কোথায় সে যাবে?

যাক, যেখানে খুশি।

মনে আমার কোনও আঁচ নেই—একটুও খটকা নেই।

ধীরে-ধীরে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

তখন চাঁদ উঠেছে।

বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম।

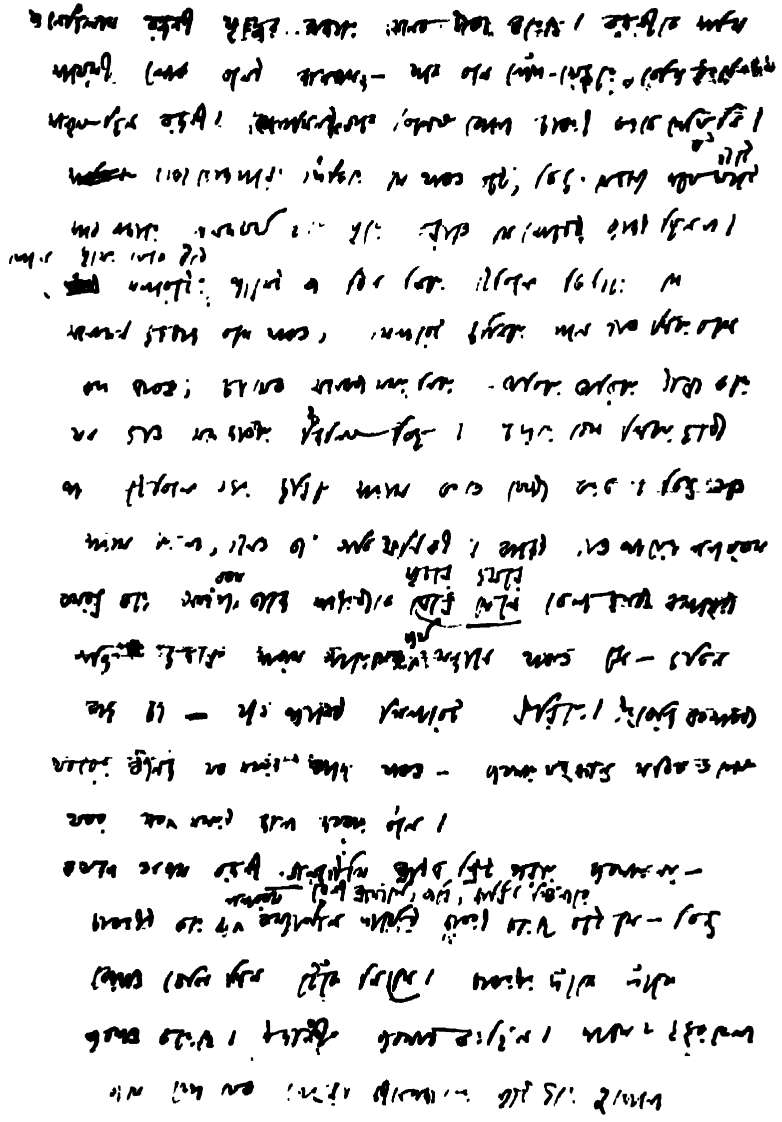
কলকাতায় গাড়ি চাপা প'ড়ে আমি পিষে গেছি—আমার পেটের ছেলের হাড়মাস বটিয়ে গেছে।...আচমকা ঘুম ভাঙতেই দেখি আমাদের সেই আটচালার খটখটে হাবলিখানা। নিম বকুল আম কাঁঠালের গাছে রোদ ঝাঁপাঝাঁপি করচে। আমের বোলে বোলতাগুলো উড়ে বেড়াচ্চে।...দূরে-দূরে দয়েল বৌকথাকও ডাকচে। আর আমার কোলে আগলে ব'সে আছেন আমার স্বামী।

মনে পড়েছে—কাল অনেকটা রাতে বামাপিসি এসে আমাকে কলকাতার নানা রকম গল্প শোনাচ্চিলেন।

তাই মগজে সারা রাত ব'সে স্বপ্নের খেয়ালখুশি ঘোঁট পাকাচ্চিল।

কিন্তু স্বামী যে এসেচেন, সেটা তো মনের খামখেয়ালি নয়। এত তাজা-তাজা চুমো, এম্নিতর সোহাগের আলিঙ্গন স্বপ্নের দেশের লোক কোনও দিন পেয়েছে কি?

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩০
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত



৮১ পৃষ্ঠার 'পারিজাত' গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি।

রাজমোহন

লিখেছে তা তো তিনি টেরও পান নি ; হিরণের একটা লেখাও আজও অব্দি তিনি প'ড়ে দেখছেন না, তার লেখার জন্য হিরণকে আজও অব্দি একটা কথাও তিনি বলছেন না; কিন্তু কেন? কেন—তিনি তার খোঁজ কারু কাছেই দিতে চাচ্ছেন না ; ছেলেকে তিনি শুধু ভালোবাসেন ব'লেই নয়, জীবনের মর্মটা হরনাথবাবুদের চেয়ে তিনি ঢের ভালো বোঝেন ব'লেই হয়তো।

হিরণ যে আজও লিখছে—হয়তো আগেকার মতোই, কিম্বা তার চেয়েও এক পোঁচ দু' পোঁচ বেশি কাদা?—এই জীবন আর কাদা—ঢের ভাববার কথা সে-সব—ছেলে যে আজও লিখছে, রাজমোহনবাবু জানেন তা, কিন্তু ছেলে লিখুক। পৃথিবীটা এখানকার এই কলেজ কমিটির—সব দিকের সব কমিটির চেয়েই যে ঢের বড়ো—সত্তর বছর ঘরের কোণে ইস্কুল মাস্টারি ক'রেও রাজমোহন তা জানেন ; পৃথিবীটা ঢের বড়ো, জীবন অসম্ভব রকমে গভীর—কলেজ, কমিটি, ব্রাহ্মসমাজ, হরনাথদা, শ্রীকান্তবাবু—তার কিছুই জানেন না ; এঁরা এত ছোট হতে জানেন।

কিন্তু তাই ব'লে হিরণ হয়তো খুব বড়ো নয় ; হয়তো এঁদের চাইতেও বড়ো নয় সে; কিন্তু—হয়তো—

হিরণকে কুড়ি বছর অব্দি রাজমোহন খুব মন দিয়ে দেখেছেন; আজ তার তেত্রিশ; এই তেরো বছর ধ'রে নিজেকে একটা বুড়ো বাজপাখির মতো মনে করেছেন রাজমোহন—লুঞ্জ-তুঞ্জ জবুথবু—সবই ঝুলে যাচ্ছে রেশমের মতো পশমের মতো, মিষ্টি চুলের- আঘ্রাণের ভিতর কঠিন টাকের খোঁচা ও খিঁচুনির মতো জীবনের ভিতর নীতি এসে পড়ছে ; টাকের মানেই ভারিক্কি—ভড়ং—তার পশমের অপর্যাপ্ত প্রচুরতার অবাধ আস্বাদের পোঁদে-পোঁদে ছ্যাঁদা দেখছে সে শুধু—উকুন দেখছে—এঁটুলি দেখছে—জীবনকেও নীতি তেমনি ধমকাচ্ছে

হরনাথদাদের কলেজ কমিটির ভিতরেও সেই কঠিনতা।

হিরণও ব্রাহ্মসমাজের অস্থিমজ্জা হয়ে উঠতে পারত, হরনাথবাবুর ডান হাত হতে পারত সে,—

কিন্তু সে-সব যে কিছু হয় নি, সেই হয়তো ভালো হয়েছে।

হরনাথদারা এ-সব কিছু বোঝেন না।

ব্রাহ্মসমাজ আর নীতি এঁদের পলিটিক্সের থেকে খসিয়ে রেখেছে—সাহিত্যের থেকে, জীবনের থেকেও।

ব্রাহ্মসমাজ—সমাজ চিরদিনই একটা দোমড়ানো জিনিস ; জীবনকে মুচড়ে যা পাওয়া যায়, তা-ই নীতি ; এক-এক হাতের মোচড়, এক-এক জায়গায় মোচড়—এক-এক দিনের মোচড়—এক-এক মিনিটের মোচড়—কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই : আঘ্রাণ থেকে—যাঁর, আকাশ রোদ সমস্তই কুয়াশার মতো হেঁয়ালির মতো ঝিমিয়ে আসছে—নতুন চিলের মতো আজকালকার ছেলেরা কী করে, তাঁর সন্তানই-বা কী করছে—সে-সব বুঝে দেখবার ক্ষমতোও যাঁর নেই, কিছু সাধও নেই—না জানি কোন্ গভীরতার আকাশের ভিতর তারা হারিয়ে যাচ্ছে এই বুঝে একটা বিস্ময় রয়েছে। যে-জীবন তাদের এমন ক'রে চালাচ্ছে, তার উপর একটা নির্ভর রয়েছে ; আশ্বাস আছে।

সেই সে-দিনকার পুরোনো জিনিসগুলো ও আজকের যা : এটার দু'য়ের মিল-অমিলের কথা—রাজমোহনবাবু এম্নি ক'রে মেটাচ্ছেন। ভাবছেন : এম্নি ক'রেই তো আমি মিটিয়ে এসেছি যখনই ছেলেটাকে অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব'লে মনে হয়েছে, কিন্তু ভাদ্রের ধানের মতো তার সমস্ত কথা ও কাজের ভিতর একটা আস্বাদ পাওয়া গেছে—ইঁদুর আরশোলা পেঁচা বনশোর সজারু শেয়াল তার উপর যতই অন্যায় করুক না কেন, আমি তার ন্যায্যতা বুঝেছি। রাজমোহন ভাবছেন : এই তেরো বছরের এই রকম দিনগুলোর ভিতর কখন এক সময় সে লিখতে আরম্ভ করেছে ; হিরণের মতো ভাবে যদি আমারও জীবন বেড়ে উঠত, হয়তো আমিও ঐ রকম লিখতাম ; ছেলেটাকে পড়াশোনায়—লেখার ভিতরে—ও এই রকম ধরনের যথেষ্ট আইডিয়ার ব্যাপারে ঢেকে-ঢুকে থাকতে দেখে আমারই এক-এক সময়ে ইচ্ছে হয়েছে : ওর মতন যদি একটা জীবন পেতাম—বিকেলের মেঘের রং হেমন্তের খোড়ো-ঘরের উঠোনে খড়ে ঘাসে পাতায় পালকে জানালায়—জীবনে লাগলে সমস্ত হিম ও মৃত্যুর ভিতরেও যেমন একটা ভরন্ত ভাঁড়ারের গভীর গল্প পাওয়া যায়—হয়তো স্বপ্নের ভিতর দিয়েই—হিরণের প্রতিটি অকাজের ভিতরেই যেন সেই ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে—কিন্তু কেউই যেন তা বুঝছে না।

কংগ্রেস ওকে চাচ্ছে বটে—কিন্তু হিরণ কি কংগ্রেসকে চাচ্ছে? ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারিকে এড়াচ্ছে কেন তাহ'লে সে? কোনও পুলিশের ভয়ে নিশ্চয়ই নয়—কোনও অভাবের ভয়ে, কোনও অনর্থের ভয়ে, কোনও দুর্ঘটনার ভয়ে—কিছুতেই নয়; বছর পাঁচ-ছয় হ'ল কলেজের কাজে যাওয়ার পর থেকেই এই সব সে ঢের পেয়েছে—একটি স্ত্রী পেয়েছে, মানুষের হাড়ের ভিতরেও যে হ্যাঙ্গামা বাধায় ;—একটি মেয়েও কবে পেয়েছে, আশ্চর্য, এই রকম স্ত্রীরই গর্ভের থেকে।

মানুষের মাথার ভিতরে কৃমির মতো ছেলেটার জীবনের মধ্যে এই সব ; কিন্তু নিজের চোখের চাউনি দিয়ে বাঘের চোখকে ভয় পাইয়ে দেব—এম্নি একটা চোখের শীত সহিষ্ণুতা রয়েছে যেন হিরণের জীবনে ; জীবনের এই / বেকার / বেকারের এই /

অপয়া বউ-মেয়ে নিয়ে চব্বিশটি ঘণ্টার / ওর এই কারাগারের ভিতর দিয়ে দেখছি আমি।

কিছুকেই গ্রাহ্য করে না ছেলে।

তবুও জানি, কংগ্রেসকে ধরতে কেন ওর অসাধ।

প্রায় দশ-বারো বছর আগেই দেখেছি ব্রাহ্মসমাজ ওকে পাচ্ছে না ; কেন, তা জানি; ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে থেকেই আজ আমার সত্তর হয়েছে ; অনেক সার্মন শুনেছি—দিয়েছিও ঢের। 'সাধনভবন', 'উপাসকমণ্ডলী', 'আচার্য-আশ্রম'—এ-সবের ভিতর থেকে কোনও দিন বেরোতে পারত ব'লেও মনে করে নি ; সব-সময়েই শুনেছি জিজ্ঞাসার সঙ্গে ধর্মের বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই, যদিও তত্ত্বের জিজ্ঞাসা : তত্ত্বজিজ্ঞাসা চলতে পারে। তাই তো মেনে এসেছি : ভূত যেমন ক'রে সর্ষে মানে তেমন ক'রে তো ঠিক নয়; আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করেছি ; আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেছি—বিশ্বাস ক'রে আস্বাদ পেয়েছি। একটা কথা হরনাথদারা প্রায়ই বলেছে : কলেজের চৌহদ্দিতে নেমে পোড়োদের কাছে যত খুশি ক্যাটেচিজম কোরো ;—কিন্তু ভগবান আমাদের কানাচের বাইরে, না তাঁকে আমরা বানিয়েছি ; তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে গোর দিতে পারা যায় কী না ; তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু লাভ আছে কী না ; না, সৃষ্টি এম্নিও চলতে পারে তার অমঙ্গলের দিকে কিম্বা মঙ্গলের দিকেই; প্রার্থনা বা সাধনার কোনও মানে আছে কী না ; না, এ-সব কাজ চেষ্টা ও আইডিয়ার মুহূর্তগুলোকে নষ্ট করে শুধু—এম্নিতর বেকুব বেল্লিকের মতো মনের ভাব নিয়ে ভগবানের রাজ্যে ঢুকতে পারা যায় না ; জ্ঞান—জিজ্ঞাসা—মীমাংসা সমস্তই বদজ্ঞান—বিদঘুটে জিজ্ঞাসা—ব্যভিচার—লম্পটতা ; তিনি আছেন—সকলের মঙ্গলের জন্য আছেন—আমরা প্রার্থনা ক'রে নিজ-নিজ জীবনে তাঁর বিশেষ কৃপা পেতে পারি—এম্নিতর একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সিদ্ধতা নিয়ে না বসলে তিনি কাউকে ধরা দেন না—ব্রহ্মজ্ঞানেরও অধিকারী করেন না : জিজ্ঞাসা নয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ; জ্ঞান নয়, ব্রহ্মজ্ঞান। মোটামুটি এই।

এম্নি ক'রে এই বুড়োরা ছেলেদের বোঝাত : সব ছেলেরাই বুঝে চ'লে যেত। অন্তত চ'লে যেত তো ; রাজমোহন নিজেও এক সময় ছেলেদের এম্নি ক'রে বুঝিয়েছেন। কিন্তু, তবুও,—ক্রমে-ক্রমে—সত্তর বছরের মাথা—মাথা?—ধরো, হৃদয়ই—সত্তর বছরের হৃদয় পাকিয়ে দেখা এই পৃথিবীর গিঁটে-গিঁটে আনাচে-কানাচে এমন অতি তুচ্ছ জিনিসও এসে তাঁকে এঁটুলির মতো আটকে ধরেছে/একটা ঘেয়ো কুকুরের মতো যেন হয়ে যাচ্ছে জীবনটা এই সব এঁটুলির খোঁচায়—খিমচিতে—কামড়ে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আস্তে-আস্তে ন্যাংটো জিজ্ঞাসায় নেমে পড়ছে শুধু,

ব্রহ্মজ্ঞান শুধুমাত্র বোগ্‌দা কাণ্ডজ্ঞানে।

কিন্তু, তবুও, বিশ্বাস খানিকটা রয়েছে—বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করলে বিশেষ জীবনের উপরে তিনি বিশেষ ভাবে কৃপা করবেন—এ-সবের গোখ্‌খুরি অনেক দিন হয় ছেড়ে দিলেও।

এখনও খানিকটা নির্ভর রয়েছে তবু—আশ্বাস রয়েছে—অনেক চেষ্টা ক'রেও

রাজমোহন যা কিছুতেই ছাড়াতে পারছেন না, মরামানুষের নাভিটাকে কোনও আগুনেই যেমন আর পুড়িয়ে শেষ করতে পারে না।

যাক্, এই নির্ভরটা থাকুক—মঙ্গলে অমৃতে আলোয় এই বিশ্বাসটুকু। জীবনের এই বয়সে এই নির্ভরতাটা না হ'লে চলেও তো না।

কিন্তু ছেলে—হরনাথদাদের সার্মন সব-চেয়ে আগে ছেড়ে দিয়েছে—ব্রাহ্মসমাজের টেনেটগুলো (যে-কোনও সমাজের টেনেটই সে ছাড়ত)—ছেড়েছে তারপর ; তারপর থেকে খোয়াতে-খোয়াতে—খসাতে-খসাতে—চলেছে সে—সঙ্গে-সঙ্গে গড়তে-গড়তেও : কারণ সে না কবি! কিন্তু কত দূর সে বাদ দিয়েছে—কী সে গড়েছে—গড়েছে কি কিছু? (না, খোঁচাচ্ছে কাটছে আজও?) ঠিক ধরতে পারছেন না রাজমোহন—

কিন্তু, তবুও, বুঝেছেন যে, অনেক জিনিসকে ঘৃণা ক'রে অনেক রকম বিশ্বাস হারিয়েও নিরর্থকতাকে বা মরণকে ভালোবাসে যে-ছব্‌ছবানি হিরণের ভিতর তা নেই ; এই জীবন—জীবনটার মাংসেরই রগে-রগে কখনও শ্যাম্পেনের মতো, কখনও কাসুন্দির মতো, যে-ঝাঁঝ ও ঝাল রয়েছে খোকার জীবনে সে-সবেরও শেষ হয়ে গেছে—বেকার থেকে-থেকে, অভাবের ফালা-ফালা হতে-হতে। এই রকম খ্যাটখেটে মেনি-বাঁদরের ডিমের মতো স্ত্রী পেলে, পিলপিলে এক রাশ পিঁপড়ের মতো শুড়শুড়ে গুড়গুড়ে এই ব্যাঙাচির মতো রোগের ডিম এই মেয়েটাকে পেলে! সংসারে বিশেষ কোনও সাধ নেই খোকার ; জীবনে? কিন্তু জীবনটাও অনেকখানি এই সংসারটাকে নিয়ে—

মেয়েমানুষ বলতে যদি মেনিখাটাশকে বোঝায়, আর মেয়ে বলতে হিলহিলে একটা ব্যাঙাচিকে, তা হ'লে মানুষের স্বামী হয়েই-বা কী—পিতা হয়েই-বা কী?—সাধ কোথায়? শান্তিই-বা কৈ?

অথচ পৃথিবীতে পিতা—স্বামী : যতটুকুই সে বুঝুক না কেন, নিজেও কি রাজমোহন উথোলপাথোল হয়ে বোঝেন নি যে, পুরুষ হয়ে কত সুখ, স্বামী হয়ে ; পিতা হতে গিয়ে কত সাধ, পিতা হয়ে কত শান্তি : সবটুকুর মাঝে কতখানি আস্বাদ? হায়, খোকা!

কিন্তু স্ত্রীই তো সব মেয়েমানুষ নয়—হিরণ যদি আর-কাউকে ভালোবাসত! আর কোনও মেয়েমানুষকে হিরণ যদি ভালোবাসত—জীবনে একটা পথ থেকে যেত তা হ'লে—ট্রেন বা টেলিগ্রাফের তারের সরাসরি পথ না হ'লেও (বুড়ো অতটা দূর চান না : সত্তর বছরের বুড়ো)—গভীর রাতে সমস্ত ঠাণ্ডা মেরে গেলে এই খোড়োচালের নীচেই ঘাড় গুঁজে দু' দণ্ডের আস্বাদ—

কিম্বা এমন ন্যাকা আস্বাদকে হিরণ হয়তো অনেক দিন হয় পেরিয়ে গেছে—

ছেলেটা কঠিন—নতুন ; জীবনে খোকার মেয়েমানুষ ছিল বটে এক সময়—কিন্তু টিয়েপাখির মতো তাঁর নাকের বাঁকা ডগা বাগিয়ে বুঝেছেন রাজমোহন যে, খোকা আজকাল মেয়েমানুষকে ঘেন্নাও করে না—ভালোও বাসে না ; কোনও এ-দিককার ও-দিককার মেয়েমানুষ নেই তার জীবনে—কোনও চিহ্নও নেই। বউয়ের জন্য সে বোধ করে—মেয়ের জন্য ; সংসারের জন্য ভাবে—

বেকারের কঠিন ব্যাগার দিনরাত তাকে ঠেলতে হয়—কিন্তু এই বয়সে মানুষ যা চায়—একটু মাংসের রগড়—মেয়েমানুষ নিয়ে রং—রোমান্‌স্‌—ভালোবাসা—হিরণের জীবনে ফুরিয়ে গেছে সে-সব ;

রাজমোহনের জীবনে ষাট বছরেও ফুরিয়েছিল কি? আহা, খোকা! বিয়ের পর থেকেই হিরণ আর না পেরে বৌটাকে গাল দিত—অ্যাবনর্মাল ব'লে : এ-কোঠায় থেকেও রাজমোহন তা শুনেছেন—প্রতিটি রাতই : পুরুষের সেই কাতর খেদ—পুরুষের জীবনের সেই ব্যর্থতা ; হায়, এই মেয়েটা স্বামীকে কিছু দেয় নি—কোথাও মাংসে তার রোগ রয়ে গেছে হয়তো, অভাব রয়ে গেছে—হয়তো রুচিতেই ; এই বেকুব বেল্লিক উইয়ের ঢিবিটাকে নিয়ে পুরুষ—হিরণের মতো পুরুষ প্রথম রাতেই যে কেন লাথি মেরে গুঁড়োগুঁড়ো ক'রে ফেলে নি, রাজমোহন আজও তা বুঝতে পারছেন না।

সমস্ত শীতের প্রকাণ্ড রাত ভ'রে তিনি ভেবেছেন—বিয়ের পরের সমস্ত বছরটা ভ'রে যে-যে জিনিস পাখি ফড়িং—এমন-কী কীটের ভিতরেও—এমন-কী মানুষের কাছেও—এত সহজ—এত সুখের—এত সাধের—ঐ খুখুরে বুড়ির কি অধিকার আছে তার থেকে খোকাকে ঠেকিয়ে রাখা—ঠকিয়ে রাখা?

সমস্ত শীতের প্রকাণ্ড রাত ভ'রে ঐ পাকুনি বুড়ির ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেয়েছেন না রাজমোহন? শুনতে-শুনতে তাঁর নাড্ডিহাড্ডি জ্ব'লে খাক হয়ে যায় নি কি? পুরুষকে—যৌবনকে—এম্নি ক'রে ঠাট্টা করা? ছাতি ফাটার ঢের আগেই পিপাসা আসে ; জল দেবার—সেই উপযুক্ত সময় ; হয়তো সব-চেয়ে বড়ো ধর্ম তার, যে এই জল দিতে পারে—সব-চেয়ে বড়ো পাপ, হায়, যে পারে না।

কিন্তু পুরুষ যখন মেয়েমানুষকে আস্বাদ করতে চায়—হায়, প্রথম আস্বাদ করতে চায়, প্রথম আস্বাদ করতে চায়—তখন যে-স্ত্রী তাকে দিতে পারে, সে জলের চেয়েও গভীর—নিবিড়ো—নয় কি? আহা, নয় কি তাই!

কিন্তু হিরণের হাড় জল পায় নি—এক মুহূর্তের জন্যও না; এক বছর ব'সে নিজেকে আগুনের জিভ দিয়ে চাটিয়ে জীবনটাকে রুটি-সেঁকা তাবার মতো ক'রে রেখেছিল : সাধারণ মানুষের যে-কোনও সহজ ফুর্তিও তাতে লাগতেই ছ্যাঁৎ ক'রে উঠে ছারখার হয়ে যেত।

রাজমোহন সবই দেখেন নি কি?

একটা নোংরা ঘেয়ো বিড়ালের বিষকেই বিছানায় জায়গা দিয়েছিল হিরণ-বউ। ছেলেটা বউয়ের গায়ে একটু হাত দিতে গেলেই দাঁত-খিঁচুনি আরম্ভ হ'ত তার, বিড়ালের মতো দজ্জাল রাগে জিঘাংসায় গায়ের প্রতিটি রোমই যেন কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠত নুড়োমুখির—ঘাটের মড়াটার ; এই বেড়ার এ-পাশে থেকে হিরণের বিয়ের পর একটি বছরের প্রতিটি প্রকাণ্ড রাত ভ'রেই রাজমোহন সব শুনেছেন—সবই বুঝেছেন—হাড়ের প্রতিটি কুচিরই তাতের ভিতর দিয়ে সমস্তই অনুভব ক'রে দেখেছেন তিনি।

মানুষের পৃথিবীতে এমন হয়, জানতেন না তিনি।

পাশেই পাখির পৃথিবীকে তিনি টের পেয়েছেন—শীতের প্রকাণ্ড রাতের গভীর মুহূর্তগুলি ভ'রে ; হিরণ-পটলির খোপের পাশেই চবুতরার প্রতিটি খুপরিরই ধলা পায়রাগুলো—শীতের জ্যোৎস্নায় ; হিজলগাছের পাতার শিশির খেয়ে পেঁচা আর পেঁচানি শিঙের মতো বাঁকা চাঁদের দিকে মুখ রেখে ; নারকোলগাছের ঝোপড়া মাথার আবডালে বাজকুড়ুল—তার কুড়ুলি ; তালগাছের নীল পাতার ছায়ায় কুয়াশায় জ্যোৎস্নায়—চিল, চিলগিন্নি তার।

এ-সব নিবিড়ো জিনিস কি শুধু এক দিনের দেখা?

তাঁর নিজের জীবনেরই বিশ থেকে ষাট—এই চল্লিশ বছরের গভীর রাতের আস্বাদের সঙ্গে এই পাখির পৃথিবীও জড়িয়ে থাকত ;—আহ্লাদকে—সাধকে—তীব্র আনন্দে উদ্ভাসিত ক'রে দিতে থাকত।

আর এই ছেলে—এই কবি—

জীবনের উচিত ছিল না কি—কি না উচিত ছিল এর পক্ষ হয়ে সহানুভূতি দিয়ে—বোধ দিয়ে—স্বপ্ন দিয়ে—কুহক দিয়ে পৃথিবীকে এর জন্য তৈরি ক'রে দেওয়ার—রাখবার? জীবনের কি না উচিত ছিল তার ভাঁড়ার থেকে সম্পদ দু' হাত ভ'রে—এই ছেলেটির জন্য ছড়িয়ে রাখবার—অপচয় করবার—উজাড় ক'রে দেবার?

কিন্তু তার আস্বাদ করবার এত শক্তি আছে ব'লেই কি জীবন তাকে বেকার ব'সে থাকবার চেয়ে বেশি কিছু দিল না, হরনাথদাদাদের খ্যাংরার চেয়ে বেশি কিছু—পটলির চেয়ে বেশি—হিলগিলে ব্যাঙাচিটার চেয়ে বেশি কিছু?

কিন্তু মাংসকে আস্বাদ করাই হয়তো আস্বাদ নয় ;—মেয়েমানুষকে ভোগ করার ভিতরেই হয়তো সাধের গোড়া মারা নয় ; —বেকার—হিঁচড়ানি—ন্যাংচামি—ন্যাওটামি—রোগ—ক্ষুধা—যন্ত্রণা—নির্যাতন—অবিচার—অন্যায়—অবিশ্বাস—কিছুই হয়তো মানুষের জীবনের রোখটাকে নষ্ট ক'রে দিতে পারে না : মেয়েমানুষকে ভোগ করবার, টাকা উপায় করবার, কমিটির মিটিঙে বসবার, মন্দিরে উপাসনা করবার রোখই শুধু নয় ;—দেশকে সেবা করবার কিংবা মানুষকে সেবা করবার একটা রোখও নয়; —কিন্তু মরণকে না ভালোবাসবারই একটা স্পৃহা—বেঙাচিটাকে আঁকড়ে ধরবারই একটা ইচ্ছা—তা-ই দিয়ে পিতৃত্বকে বোঝা—পটলির কাছ থেকেই সংযম শেখা, একটা আটপৌরে স্বামিত্বের দুঃসাধ্য দায়িত্বকে বাগাবার ভিতর দিয়েই, মাংসের সহজ আস্বাদের মধ্য দিয়ে নয়—নিজের মধ্যেকার পুরুষের—মানুষের—জোরটাকে বুঝে নিতে চাওয়া—কলেজ-কমিটির সমাজের (কোথাও দেশের—হয়তো পৃথিবীর) সমস্ত হিংসা জিঘাংসা নির্যাতন সত্ত্বেও বেয়াদবের মতো বেল্লিকের মতো প্রশ্নের আগ্রহ ফলিয়ে তোলা শুধু, পরিবার কলেজ সমাজ গুঁড়ো হয়ে গেলেও,—এ-সবের আন্তরিকতা নিয়েই জীবন নয় কি?

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩১
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত

এই শীত, হেমন্ত এই

জীবনটা ঢের চিন্তা ও মতলব নিয়ে;—ঢের সিদ্ধান্ত নিয়ে বটে। কিন্তু সমস্ত মতলবকেই মৃত্যু এসে এখুনি ঢেকে ফেলছে যেন, সমস্ত মীমাংসাই, হায়, মাঠে পাকে, কিন্তু ভাঁড়ারে ওঠে না।

ভাঁড়ারে ওঠে না : কেউ এদের দিকে চায় না; কেউ এদের নিতে চায় না—কোনও ভাঁড়ারেই এরা পথ পায় না; কেন?

এর উত্তর দেবার জন্য ঘুম এসে পড়েছে—এক দিন যেমন মৃত্যু আসবে; এ-জীবনটায় এই অব্দি জানুক অমৃত।

কিন্তু বুঝছে অমৃত—সমস্ত বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়লেও অনুজা এখনও ঘুমোয় নি; দুপুরে অনুজা কলেজ করেছে; তারপর বিকেল থেকে রাত দশটা অব্দি বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে গোটা দশেক বিড়ি অন্তত পুড়িয়ে ফেলেছে; একা নয়, সঙ্গে মাতোয়ালা ছিল ঢের; তারপর হঠাৎ কখন সমস্ত নিঝ্‌ঝিম্ হয়ে গেছে—রিভল্যুশনের বন্ধুরা যে যার গর্তে ফিরে গেছে—অনুজা পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে; কলেজের টেক্সট্ বইও যে সে না পড়ে, তা নয়, কিন্তু আইরিশ রুশ বইগুলোই ঘাঁটছে এখন বেশি; কিন্তু পরীক্ষা কাছে এসে পড়লে কলেজের নোট দাগিয়ে ভালো ভাবে পাশ করতেও জানে না কি অনুজা?

এই একটা ছেলে; অথচ এমন বেশি দুর্মূল্য নয়; অমৃত ভাবছে, পঁয়ত্রিশের বদলে এই উনিশ বয়সটা যদি তার হাতে থাকত : এমন শীতে ছেলেমেয়ের বাপ না হয়ে ঝর্ঝরে অনুজাচরণের মতো; টেবিলের হেরিকেনটার পাশে একটা লম্বাটে রুশ বা আইরিশ বুলেটিনের মতো ; মাছির পাখনার মতো; নীল মলাটের নীচে মাখনের মতো; শাদা ঘুঘুর ডানার মতো; নরম কাগজে মনের আনন্দের মতো। রেডব্লু পেনসিলের এক-একটা মোটা খোঁচা দিয়ে পৃথিবীটাকে সে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারত না? জীবনটাকে কি কেয়ার করত সে?

তারপর অনুজার জন্য আরও ঢের জমা আছে।

এই বাড়ির অনেকেই সে-সব জানে না; কিন্তু এখুনি—বইটই ছেলেটার সমস্তই চুলোয় যাবে, বাতিটা একটু নিভে আসবে, বিড়ির জায়গায় একটা সিগারেট ধরিয়ে

বসবে সে—গান্ধি বা কংগ্রেসের কোনও ধার ধারে না সে, তার পথ আলাদা ব'লেই হয়তো—তারপর অপেক্ষা করবে।

অমৃত কম্বলটা একটু ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে : কিন্তু আজ রাতে জীবনের খটকাগুলো তাকে জাগিয়ে রাখছে না—অনুজার জানালায় ঘুমঘুম বাতিটা, নেভি-কাটের গন্ধ—ছেলেটার নিশ্চিন্ত অপেক্ষা—এই শীতের রাতের কেমন একটা গভীর নির্বিবাদ অমৃতকে জাগিয়ে রাখছে।

দশ বছর পনেরো বছর আগের দু'-একটা রাতের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে; পনেরো বছর কুড়ি বছর আগের দু'-একটা রাতের কথা।

অঘ্রাণের গভীর রাত যখন ফুরুতে-ফুরুতে হঠাৎ থেমে যায়—গিন্নি যখন আর গোঙায় না, খোকাখুকু কঁকিয়ে-মকিয়ে হিসির হুদ্দায় নষ্ট হয়ে গেছে যখন—ধান ঝরতে-না-ঝরতেই খড়ের মাঠের ওপারে কোকিল এক বার ডেকেই যখন থেমে গেল—মনে হয়, সবই নষ্ট হয়ে যাক, সংসারের সমস্ত হাড়গোর বেরিয়ে পড়ুক, কিন্তু খড়ের মাঠের ওপারে কোকিল অঘ্রাণের এই অসময়ে শেষ ইস্কুলের শেষ পড়ার শেষের কয়েকটা রাতকে ফিরিয়ে আনুক—পনেরো বছরের কুড়ি বছরের আগের রাত ক'টাকে আবার; এই পাখিই তা পারে—এই হিম—এমন রাতে—এই সময়ে।

ইস্কুল-ফুরুবার ভালোবাসা; হয়তো তার কোনও অস্তিত্ব নেই; ইঁদুরের ছানার কাছে ধানের সোনার শিষের কি মানে?

ধাড়ি ইঁদুরের কাছে তার রীতিমত অর্থ রয়েছে বটে—দাঁত বসাবার, শাঁস কেটে বার করবার, ক'রে নেবার; কিন্তু ইঁদুরের ছানার কাছে ক্ষেতের ছড়ার কী মানে রয়েছে—হলদে রং-এর ধানের ছড়ার?

নিজের শরীরের নরম পশম দিয়ে ধানের গুছির মখমলকে বুলিয়ে তার গন্ধের ভিতর, রঙের ভিতর, সোনার গভীর নিংড়ানির ভিতর নিজেকে রগড়ে নিয়েছে মাত্র; ইস্কুল-ফুরুবার ভালোবাসা বা সমবয়সিনীকে নিয়ে তা-ই শুরু করেছিল...; কিন্তু ভালোবাসা জীবনে এর চেয়ে বেশি গভীর কোনও দিনই আর হ'ল না,—ভালোবাসায় রোমান্স রিয়ালিজম সিনিসিজম একে-একে সবই পেকে শুকিয়ে শুঁটকি মেরে গেল যদিও।

কিন্তু অনুজার এ-জিনিস আর এক রকমের; কিন্তু তবুও সকলের সব ভালোবাসাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অমৃতকে ইস্কুলের সেই শেষ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় : সেই খড়ের মাঠকে—অঘ্রাণকে—হিমকে—বিলাসীকে—

আজ খুব অনেকখানি রাত ক'রে নীহার এসেছে।

অমৃত ঘুমিয়ে পড়লে এ-বাড়ির কেউই হয়তো জানত না অনুজাই-বা কী করছে—নীহারই-বা কোথায় গিয়ে জুটেছে—এবং এদের দু' জনের মধ্যে সম্পর্কটাই-বা কী।

অমৃতও বেশি ক্ষণ জাগছে না আর ; অনুজাচরণ আসবার দু'-চার দিন পরেই নীহার

পড়া বুঝবার ছুতোতে—কিংবা নিতান্ত প্রয়োজনেই হয়তো অনুজার ঘরে ঢুকে রাত বারোটা সাড়ে-বারোটা অব্দি গল্প করল : এই থেকে এদের আরম্ভ হয়েছে; তারপর কী দিয়ে শেষ হবে, কেউ জানে না; কেউ গ্রাহ্যও করে না যেন জানবার জন্য; রাতের এ-বৈঠকের ভিতর বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু নেই; কারণ নীহার এই বাড়িরই মেয়ে—অনুজাও বাড়ির ছেলেই—দু' জনের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা কিছু নাই যদিও—তবুও বাড়ির ছেলে মেয়ে তারা; অনুজাও ছেলে ভালো—নীহারও ভালো মেয়ে; রাত যত বেশিই হোক না কেন, এরা এমন জায়গায় ব'সে পড়াশোনা করে যে যে-কেউ যখন খুশি জেগে উঠলেই এরা তারই নিজস্ব হাতের তাসের মতো একটা পোঁচড় অব্দি তাকে গোপন করতে যাবে না।

কিন্তু জাগতে যাবে কে?

শীতের রাতে যখন বাড়িশুদ্ধ লোক নাক ডাকাতে থাকে, তখনই নীহার পড়া শিখতে যায়;—অনুজাচরণ বলে : এই সময় কেন আস? কথা দিয়েই অনুজাচরণ রোজ নীহারের সঙ্গে আলাপ শুরু করছে, কিন্তু এ-কথার জবাবের জন্য একটুও অপেক্ষা করছে না সে : অমৃত বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রোজ এই অব্দি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে। তারপর বিপ্লবের কথা আরম্ভ হয় : সে-কথা যেন আর ফুরুতেই চায় না; এদের চাপা উত্তেজনার মিষ্টি কুয়াশার ভিতর অমৃত ঘুমকে আস্বাদ করতে থাকে।

ঘুমের ভিতর দিয়েও সে যেন বুঝতে থাকে যে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, গোয়াল-ঘর গিন্নিপনা, খোকাখুকুর ফ্যাঁকড়া,—সেখানে যত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারা যায়, ঘুমই ভালো সেখানে; মৃত্যুই ভালো।

কিন্তু অঘ্রাণের—পোষের এ-রাতগুলো—বিশ বছর আগে—পনেরো বছর আগে—কিছুতেই তাকে ঘুমোতে দিত না—খড়ের গন্ধ, ভরন্ত ভাঁড়ারের আস্বাদ—মাঠ—বাতাসের গায়ে হিমের ঘ্রাণ—শীতের রাতের রং—বছরের এই সময়টাতে অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখত তাকে। সে এক অনির্বচনীয় উপলব্ধির সময় গিয়েছে জীবনে!

কিন্তু বিয়ে করার পর—খোকাখুকু হতে-না-হতেই ভাত-ঘুম চ'টে যাবার ভয়ে অমৃত অস্থির—আকাশ মাঠের রগড় তো দূরের কথা, অন্ততঃ খোকাখুকুকে নিয়ে কাল সে কী করবে, সে-ভাবনা কালকের জন্যই রেখে দিয়েই ঘুমিয়ে সে বাঁচতে চায়।

নানা রকম ঘ্যাটঘ্যাটানিতে অবসন্ন শরীরে ঘুম আসেও।

কিন্তু অনুজাচরণ আজও জাগছে, নীহারও জাগছে—

সেই নেভি-কাট সিগারেটের গন্ধ; সেই বিপ্লবের কথা; গান্ধিকে আরও পিঁজে উড়িয়ে দিচ্ছে; কংগ্রেসকে মানছে না অনুজা; অতীতকে মানছে না, ইতিহাসকে মানছে না; ক্ষমাকে মানছে না, ধর্মকে মানছে না; সমাজকে না, বিশ্বাসকে না : কিন্তু মেট্রিকুলেশন ক্লাসের নীহার এ-সবের কী বুঝছে—কিম্বা, বুঝছে হয়তো; অন্ততঃ বুঝবার গরজ র'য়েছে : অনুজারও বোঝাবার গরজ শীতের রাতের কুয়াশার চাদরটাকে বেশ গরম ক'রে রেখেছে। সমস্ত জীবনটা ঘিরে একটা বিহ্বলতা র'য়েছে—কেমন একটা বোধের ব্যথায় প্রাণটা টন্‌টন্ করছে তার।

জীবনের কোনও গিঁটে কোনও গৌরব নেই, কোনও লড়াইও নেই যেন, কিন্তু তবুও অমৃতও বোঝাতে চায়;—সামান্য মানুষ সে-ও বটে, সহজ মানুষের মতো খেয়ে ব'সে সন্তান জন্মিয়ে সে যেন গরজ মিটিয়ে ফেলতে পারছে না; বরং এ-সব না ক'রে অন্য কিছু একটা করলে সাধ মিটত না কি তার?

কিন্তু মেটামেটি দূরের কথা, তার বক্তব্যটাও কাকে সে বলবে? গিন্নিকে? অমৃতকে সে বুঝবে না; শুনবার গরজও নেই বৌয়ের; তা ছাড়া অমৃত লক্ষ্মীমণিকে ভালোও বাসে না।

লিখবে? কিন্তু লিখতে পারে না সে।

লিখলেই-বা ছাপাবে কে? এমন কোনও নচ্ছার প্রেসও না।

ছাপালেই-বা পড়তে যাবে কে?

এক জনও না।

রাত বোধ হয় দু'টো বেজে গেছে।

এই শীতের রাতে নীহারের এই গরজ, আহা!

অনুজার এই হাড়খটখটে বিপ্লবের মূলসূত্র, মিথ্যা তর্ক, মিথ্যা অনুমান, মিথ্যা ধারণা, মিছা সিদ্ধান্ত, বেয়াড়া ইতিহাস, বেহায়া ইকনমিক্স, বেকুবের মতো হাসি, বেল্লিকের মতো ইয়ার্কি—এ-সবই তো এই মেট্রিকুলেশন ক্লাসের মেয়েটা গিলছে—রাত দু'টো অব্দি—হয়তো সমস্ত রাত ব'সে; কীসের জন্য?

সেই (প্রায়) বিশ বছরের আগের কথা মনে পড়ছে; সেই বিলাসীকে; সেই সতেরো বছরের ছেলের চোদ্দ বছরের মেয়ের সেই—

বিলাসী আজ কোথায়?

লক্ষ্মীমণির জায়গায় যদি বিলাসী এসে বসত?

কিন্তু কী আর হ'ত তাহ'লে? কিছুই কি হ'ত?

হ'ত আর কী? সমস্ত জীবনের ভিতর তার আঁকড়াবার মতো একটা যা কিছু তার আছে : ইঁদুর ছানার—ধানের ছড়ার —ভালোবাসা—সেইটেও যেত মাটি হয়ে; অনুজা শুধু বুলেটিন আওড়ায় মাত্র, জীবনে অবিশ্বাস—খাঁটি অভক্তি অনুজার চেয়ে অমৃতের হাজার গুণে বেশি; অভিজ্ঞতা ঢের বেশি গভীর। এই অভিজ্ঞতার মুখে সমস্ত কিছুই ছোবড়া হয়ে যায়, গেছে যেন, ছোট হয়ে গেছে, শুঁটকো হয়ে গেছে, ভোস্‌কা বোঁটকা ঠুঁটো টুনো হয়ে গেছে সব—

একটা সোনার জিনিষ আছে শুধু।

একটা সোনার জিনিষ আছে : বিলাসী।

জীবনে তাকে পেতে পারত না কি অমৃত? যে-খাটে খোকাখুকুকে নিয়ে লক্ষ্মীমণি মাংসের পিণ্ডের মতো অশ্লীল হয়ে প'ড়ে রয়েছে, বিলাসীকেও সেই জায়গায়ই মাস-কাবারের রক্তের মতো বীভৎস ক'রে রেখে দিতে পারত।

জীবনের তারপর কী আর থাকত।

ভেবে দেখতে গেলে আজও হয়তো কিছু নেই; বিলাসী হয়তো আজও অন্য কোথাও ঠিক ওম্নি অবস্থায়ই প'ড়ে রয়েছে;

কিম্বা হয়তো তা প'ড়ে নেই—কে জানে?

অমৃতের জীবনের সেই গল্পটা—সে যা-ই হোক না কেন—আজকের-বিলাসীকে নিয়ে নয় তো।

ইস্কুল-ফুরুবার ভালোবাসা : শেষ ইস্কুলের শেষ পড়ার শেষের কয়েকটা রাত : এম্নি হিমের ভিতর, শেফালীকে মেড়ে, কোকিলের ডিমকে কাকের বিছানায় পাঠিয়ে দিয়ে, নদীকে শুকিয়ে ফেলে, ধানের সোনাকে ঝরিয়ে দিয়ে, সমস্ত পৃথিবীকে ধানের খোসার মতো—খড়ের মতো—কঠিন ক'রে দিয়ে, শীত তবুও কী গভীর আস্বাদ এনেছিল জীবনে তার।

শীতই এমন আস্বাদ আনে—হেমন্ত, শীত।

এরা সংরক্ষণ ক'রে; হিমের শান্তির ভিতর দিয়ে কোনও কিছুকে পচতে দেয় না; শিশিরের বরফে-বরফে মরা স্মৃতিকে জমিয়ে রাখে; মৃত গল্পের মাংসের দুধের রঙের উপর কোনও কুতূহলের—কোনও জিজ্ঞাসার—নোংরা মাছিকে বসতে দেয় না, খটকা-খোঁচার দুরন্ত কৃমির হাত থেকে ভালোবাসার মধু রঙের মাংসকে বাঁচিয়ে রাখে...এই শীত, হেমন্ত এই।

রচনাকাল : ? খ্রি. ১৯৩২

হৈমন্তিক

স্টিমার-অফিসের বাড়িগুলো—অফিসারদের কোয়ার্টার নদীর পাড় দিয়ে-দিয়ে অনেক দূর চ'লে গিয়েছে; মাঝে-মাঝে এক-একটা বড়ো ফুটবলের মাঠ—মাইলের-পর-মাইল ঝাউগাছের সারি; আশ্বিন-কার্তিকের ধানের ক্ষেত; হেমন্তের সন্ধ্যায় নদীর পাড়ের পথে বেরিয়ে মনে হয় যে, বরাবর কলকাতায় থাকা যার অভ্যাস তার সে-জিনিসটার হাড়নাড় চটকেও বিলেতের যতটুকু গন্ধ সে পায় তার চেয়েও ঢের গভীর ক'রে কোন এক বিদেশের ঘ্রাণ যেন এইখানে পাওয়া যাচ্ছে।

এ বাংলা নয় যেন—ভারতবর্ষ নয়; ফ্রান্সের—হয়তো জার্মানীর নদীর ধারের ওটের হুইটের ক্ষেতের পাশে এই সব পাখি থাকতে পারত, এমন ঝাউগাছ, স্টিমার-অফিসের সাহেবদের ওই গথিক ধরনের বাড়িগুলো, পোর্তুগীজ ক্রিশ্চানদের বাংলো, রক্তের রঙের টালিগুলো, ঘাসের অবাধ মাঠগুলো, ওই সবুজ মাঠের এই নীলচে পাতলা জঙ্গল, নদীর উপরের কুয়াশা, কলমের নীল কালির আঁচড়ের মতো দূরের গাছগুলো—পোড়া ইটের মতো, ইট পোড়াবার আগুনের মতো মেঘের ওই রং—প্রথম শীতের খোঁচায় খড়ের ভিতরের পাখির মতোন শরীরটাকে আস্বাদ করবার এই অবসর, হেমন্তের বিকেলের এই অন্ধকার, মৃত পাখির বুকের মতো এই নিস্তব্ধতা, এই জাদু। কোনও দিনই কী সত্যেন কলকাতার পথের হেমন্তে এই সব অনুভব ক'রেছে?

কলকাতায় বছরের আরওটা মাসই ঘুলিয়ে পেঁচিয়ে এক—

জীবনকে আস্বাদ করতে হয় শহরের থেকে বাইরে এসে—এই পৃথিবীটাকে; এই জাদু!

নদীর পাড়ের মিউনিসিপ্যাল রাস্তার—দেখছে সত্যেন—কী উন্নতিই-না হয়েছে; গুদামবোঝা এক-একটা লরি অন্ধকারের পথে ঝকরঝকর ক'রে চলেছে—কিন্তু স্টিম-রোলার ফি-বছর রাস্তাটাকে এমনই মজবুত বানিয়ে যায় যে, কারু ভাববারই অবসর থাকে না যেন যে, সেটা বছরের-পর-বছর কী রকম নিরেট—নিটোল হতে চলেছে। ইংরেজ শাসনের—ইংরেজি ব্যবসায়ের একটা ইনস্টিটিউশনের মতো এই রাস্তাটা;—শুধু রাস্তাটাই কী? এখানকার ঢের কিছু।

বৃষ্টির সময়টা ছাড়া দেশে থাকবার অবসর পায় না সত্যেন। কীন্তু এ-বার সে কার্তিক মাসেও এখানে আছে—শীতেও থাকবে; কোনও দিকে কোনও কিছু সুবিধে শীগগির হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যা দিনকাল। বেকারের দিনগুলো পৃথিবীটাকে আস্বাদ করবার সুবিধে ক'রে দেয় এত গভীর ক'রে; এই হেমন্ত—দেশের পথের; এই শীত; কলকাতার কাজে আটকা প'ড়ে দশ-আরও বছর হ'ল এ-সবকে সে ছেড়ে গিয়েছে; হয়তো সারা জীবনেও এই পথে আর ফিরতে হত না তাকে; কিন্তু এক দিকে তুমি চাকরি খুইয়েছ আজ, সংসারের চাপ যে কী—তা খুব ভালো ক'রেই তা বুঝতে দিয়েছ, আর এক দিকে জীবনটাকে একটা শালিখের মতো ক'রে দিয়েছ তুমি হেমন্তের এই অফুরন্ত আস্বাদের কাছে।

নদীর উপর ইস্টিমারের ভিড় আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে—দু'টো বড়ো-বড়ো কোম্পানির হেড-অফিস এখানে।

রেলওয়ের কোনও কারবার নেই এখানে; ছোট এক চিলতে রেলের লাইন নদীর একটা কিনার দিয়ে গিয়েছে শুধু। হয়তো আরংজেবের আমলে কোনও একটা রেল কোম্পানি কিছু একটা করতে চেয়েছিল। স্টিমার-অফিসের সাহেবদের দু'-চারটা ট্রলি লাইনের ওপর আজ টিকটিক ক'রে ফিরছে শুধু।

রেল আসে নি,—ভালোই। কোনও দরকারও কী ছিল তার? ইস্টিমার-কোম্পানি বেশ জবর হয়ে উঠেছে; নদীটা ম'রে যাচ্ছে যেন—শুকীয়ে যাচ্ছে।

কোম্পানির সাহেবরা ডিভিডেন্ড গুনতে-গুনতে দুর্ভাবনায় মাথা নাড়তে-নাড়তে বলে : সিলটিং আপ। কিন্তু ডিভিডেন্ড কি যথেষ্ট গোনা হয় নি?

হাঁটতে-হাঁটতে ইস্টিমারের ভিড়—কারখানা—কোয়ার্টার—সমস্তই পিছে প'ড়ে থাকে; তারপর অনেকখানি নদী পাওয়া যায়—মাইলের-পর-মাইল চ'লে গিয়েছে; সঙ্গে -সঙ্গে ঝাউগাছ যাচ্ছে—ধানের—বালামের?—নীল ক্ষেতগুলো, এখুনি খড় হয়ে যাবে যেন সব—পাখিরা—কুয়াশা—পেঁচা—হাড়ের রঙের চাঁদ—দেশের পথের হেমন্তের সমস্তটুকু আস্বাদ।

দূরে একটা মস্ত বড়ো মাঠের ভিতর জিলাস্কুলটা দেখা যাচ্ছে—আঠারো-কুড়ি বছর আগের গন্ধ আজকের মতো মনে হয়।

স্কুল-কম্পাউন্ডে কেউ নেই; কোনও খেলা নেই; একটা ছেলে অব্দি জিমনাস্টিক করতে আসে নি; গভর্নমেন্টের জিমনাশিয়ামটা তার সমস্ত বাহাদুরি নিয়ে প'ড়ে রয়েছে; আঠারো বছরের পুরোনো দিনগুলোর ঘোস্ট নিয়ে। সত্যেনদের সময় এই শূন্যতা ছিল না।

তখনও পৃথিবী যেন এত নিস্তব্ধ হয়ে প'ড়ে নি।

জিলাস্কুলের মস্ত বড়ো কম্পাউন্ডে সেই যে আষাঢ়-শ্রাবণে ফুটবল খেলা শুরু হত এই হেমন্তেও তা ফুরিয়েও ফুরত না যেন; ক্রিকেটের দিন আরম্ভ হত তারপর; জিমনাশিয়ামটা সব সময়েই চোয়াড় ছেলেদের হুদ্দোয় গরম হয়ে থাকত—এই হেমন্তে সব চেয়ে বেশি ক'রে।

গভর্নমেন্টের তখন হার্ত ছিল—আজকালকার বাজেট তখনও থাবায় দাঁড় করায় নি সেটাকে।

১৯১০-এ। ১২-তে আর এক রকমের ছেলেরা ভিড় করত এই সব জায়গায়; লপেট ব্যাকব্রাশ জুলপির দিন তখনও আসে নি; —এসেছিল কী? কে জানে? কিন্তু তবুও তাদের রক্তের ভিতর জীবনের রগড়টাই ছিল যেন একেবারে আলাদা রকমের।

আজকের দিনের ছেলেরা কম্পাউন্ডটাকে শূন্য রেখে গেছে।

পৃথিবী ঢের নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; হেমন্ত তাকে আরও কত নিস্তব্ধ করবে?

বাতাসে বাবলা ফুলের গন্ধ; আঠারো বছর আগের সেই বাবলা গাছগুলো কম্পাউন্ডের এক কিনারে আজও ঠিক তেন্নি, ঠিক ততটুকু; কত দিন এরা থাকবে?

এক দিন এই ফুলগুলোর এমন হলদে রঙের কী মানে ছিল? এমন রেণুর? এই গন্ধের?

না জানি, কী? কোনও দিনও কি আর তার মানে বের করতে পারা যাবে?

সেই ছোটবেলায়—বাবলাগুলো সাহেবদের কোয়ার্টারের চার দিকে সায়েবি বেড়া তৈরি ক'রে রেখেছিল—এইটুকু ঢের মনে আছে; পথে-ঘাটে এই গাছগুলো দেখা যেত না; অফিসপাড়ায়—কোম্পানিপাড়ায় সাহেবদের বাংলোর চারপাশে যদিও ঢের প্রচুর ছিল এগুলো; সায়েবি—কেমন একটা বিলেতি—বেশ উঁচু জাতের উঁচু আস্বাদের গন্ধ বেরুত এই ফুলগুলোর ভিতর থেকে। জিলাস্কুলের কম্পাউন্ডের চার দিকেও এই বাবলার বেড়া সেই আস্বাদটাকেই পাকা ক'রে রেখেছিল যেন; স্কুল-কম্পাউন্ডের ফুল কেউ ছুঁতে পারত না; দুপুরের রোদে ছায়ায় ক্লাসের জানালার থেকে হলদে রং দেখা যেত শুধু, বোলতা উড়ত, পাপড়ি ঝরত, বাতাস মৌমাছিতে ফুলগুলো নুয়ে-নুয়ে পড়ত শুধু। হলদে ডিমের গুটির মতো ফুলগুলো ঝর্ঝরিয়ে প'ড়ে যেত—ঢের কাছে গেলে বাতাসে একটা আস্বাদ পাওয়া যেত—বাবলার আস্বাদ।

সমস্ত স্কুলের জীবনে কত বার সত্যেন এই স্বাদ পেয়েছে—ভোরে দুপুরে রাতে সন্ধ্যায় ইস্কুলের পাশ দিয়ে যখনই যত কারণে যত বার ফুলমুখ ক'রে ফিরতে হয়েছে তার।

এই ফুলগুলো—ফুলের আস্বাদ নয়, জীবনের ঢের কথা কাজ সাধ ও আশার স্বাদ মিশে রয়েছে এগুলোর সঙ্গে।

বাবলার গন্ধ আজ ব্যথা দিচ্ছে শুধু—শুধু ব্যথা দিচ্ছে।

ইস্কুলের নির্লিপ্ত কম্পাউন্ডটা—জিমনাশিয়াম—আঠারো বছর আগের হেমন্তের মতো আজকেরও এই কার্তিকশেষের বিকেল বেলা। এক দিন তা জমছিল—কোথাও কিছু সঙ্কল্প নেই যেন আজ আর; কোথাও কেউ নেই যেন; অপেক্ষা আজ আর ধর্ম নয় যেন, শুধু অপেক্ষা মাত্র; তার কিছু মানে নেই; আর কিছু হবে না।

চড়ুই খড়কুটো কুড়োচ্ছে, শালিখ ঘাসের ভিতর থেকে পোকা খুঁটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ধান ফলছে; পৃথিবীর ভিতর কোথাও কোনও সঙ্কল্প নেই বল্লে ভুল বলা হয়; এই

নিঃসাড় ইস্কুলটারও প্রাণের কেরদানি শেষ হয় নি; হয়তো একটুও না; এর ভাবনা রয়েছে—আশা আছে,—সঙ্কল্প আছে—হয়তো সার্থকতাও।

সেই আঠারো-বিশ বছরের আগের ছেলেরা হয়তো এই বাবলার গন্ধে কোনও ব্যথাই পাবে না—গন্ধই পাবে না হয়তো; ফুলগুলোকে দেখবেই না হয়তো; কেয়ারই করবে না (যদি তারা কেউ আজ হঠাৎ এখানে এসে প'ড়ে)। ইস্কুলের এই ঘরগুলো—জানালাগুলো—কার্তিকের—অঘ্রাণের শেষের রাঙা বিকেল বেলার ঘোর-ঘোর আলোর পথে এমন এই শীতের ভিতর পরিচিত কম্পাউন্ডে অপরিচিতদেরও অভাব—একটা মালী—একটা শালিখ—ক্যানাফুলগুলো—কুয়াশা কিছুই যেন এদের একটুও আঘাত করবে না; কোনও সঙ্কল্প, অসঙ্কল্প, সফলতা, নিষ্ফলতা, ছাই, ধুলো—হাতের ভিতর এক মুঠো ধুলো আর ছাই; এদের জীবনে এই সবের নিষ্পত্তি করবার সময় কোনও দিনও আসবে না।

কিন্তু সত্যেনের জীবনে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

জীবনকে কেউ অপেক্ষা করতে বলছে না আর।

কোনও সঙ্কল্পের তদ্বির প্রাণের ভিতরে আর নেই।

হাস্নুহানা আজ অত্যন্ত সাধারণ একটা গাছ—অত্যন্ত পথের ঘাটের ফুল। কিন্তু তবুও পনেরো বছর পরে অঘ্রাণের এই অন্ধকারের ভিতর—শীতের ভিতর এই আঘাত পাচ্ছে সত্যেন।

আঘাত নয় কী? আঘাতই তো; সমস্ত আস্বাদই আজ আঘাত যেন; আস্বাদ আঘাত শুধু।

হেমন্তের এই বাইরের দিক; অন্তত আজ যতটুকু পাওয়া গেল তার। কিন্তু এর ভিতরের কথাও রয়েছে।

সত্যেন ঘরে ঢুকতেই বুড়ো ধর্মদাসবাবুকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখছে। ব্যাং তাড়াচ্ছেন বাবা; খোড়ো ঘর—মাটির ভিত; সময়—কার্তিক—অঘ্রাণ—বাইরের পৃথিবী নরম হয়ে, হ'লদে হয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে, নিস্তব্ধ হয়ে যতই গভীর হয়ে উঠুক না কেন, ঘরের মধ্যের আটপৌরে সংসারে—টানাটানির ভিতর—ঢের খটকা রয়ে গেছে, খোঁচা রয়ে গেছে ঢের।

—ওই আবার ব্যাং কট্‌কট্ করছে রে, খোকা—

—করছে বটে—প্রাণ খুলেই করছে—

বর্ষায় এরা বাইরে-বাইরে ডাকে—আলাদা রকম; কিন্তু কার্তিক-অঘ্রাণে যাদের ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে এরা ডাকে, তারা বোঝে যে এ-ডাক আবার আর এক রকম।

ধর্মদাস বলছেন—খোকা দেখ তো, পাখার ডাঁট দিয়ে বেড়ো পিটোলাম—বাক্স পিটোলাম—কিন্তু থামছে না তো

—বড়ো সহজে থামে না

—কোথায় রয়েছে যে—এত সব লটরপটরের ভিতর খুঁজে বের করা; ভয় দেখাবার জন্য হিসহিস করলাম—খড়ম পিটলাম; তারপর তো এই নাস্তানাবুদ হয়েছি—কিন্তু কানেই যেন যায় না

—কান থাকলে তো; ব্যাঙেরও আবার কান!

—খুঁটির গোড়ায় আছে না কি?

—খুঁটি তো ত্রিশ-চল্লিশটা—চার-পাঁচটা চকি—পায়াগুলোর নীচে রাজ্যির ইট, বাক্স, বোঁচকা, তোরঙ্গ, কাগজের গাদি, শিশি-বোতলের ডিসপেনসারি—ব্যাং বের করা সহজ ব্যাপার নয়,বাবা,—আমার বাপেরও সাধ্যি নেই

মা নিরুপমা সায় দিয়ে বলছে—তা না তো কী; এত সাপ এত ব্যাং;সব কি গলায়-গলায় চলে? খুঁচে বের করতে পারলে তো

ছোট খোকা বলছে—হয়তো দু'খানা ইটের মাঝখানেই সে লেপটে রয়েছে

—এখন কোন ইট খুঁজতে যাবে, বাবা?

ছোট খোকা বলছে—শুধু ইট খুঁজলেই তো হয় না, মা, চালও খুঁজতে হয়; বেয়ো ব্যাং খুঁটি বেয়ে চালে উঠতে পারে—জান বৌদি

বৌদি—সত্যেনের বৌ—নির্মলা কিছু বলছে না।

বেশি দিন সে এ-বাড়িতে আসে নি—বিয়ের পর একটা বছর ঘুরে গেছে শুধু; মেয়েটির বাপ নেই—মা নেই—খুড়ো-জেঠাদের কাছে দেউঘরে—ভাগলপুরে—বরাবর থেকেছে সে—খুব ভালো বাড়িতে না থাকলেও বরাবরই পাকা বাড়িতে—কম পক্ষে শান-বাঁধানো ইটের দেওয়ালওয়ালা টালির বাংলোয়; বেহারের হাওয়া—শান—ইট—টালি—জীবনে একটা খটখটে ঝর্ঝরে ভাবকে সে জেনেছে—অস্বচ্ছলতার হাত থেকে একটা নিস্তারের ভাবকে—আশ্বাসকে।

কিন্তু সত্যেনের মুখ দেখে—যুবকটির বুক পরীক্ষা ক'রে তাকে বিয়ে করলেও সে যে বধূকে এই সবের ভিতর নাবিয়ে দেবে, বধূ তো তা কোনও দিনও ভাবতে পারে নি; স্বামীর মুখের ভিতর—শিক্ষাদীক্ষা চেহারা অভিপ্রায়ের ভিতর—তার স্বামীর সঙ্কল্পের ভিতর—কোনও গলদ সে-দিন সে দেখে নি; আজও দেখছে কি?

কিন্তু তবুও কিছুই যেন পাওয়া হ'ল না।

নির্মলা যেন চ'লে যেতে পারে।

সব—এ-সব ছেড়ে চ'লে যেতে যতটুকু সাহস চাই এক-এক সময় হাঁপিয়ে উঠে মনে হয় তা যেন তার আছে; অন্তত না থাকলে চলছে না তো।

সত্যেন এ-সব জানে।

এ-দেশে যদি তেমন কিছু একটা বন্দোবস্ত থাকত যাতে সত্যেনের এই ব্যবস্থার থেকে নিস্তার পেয়ে নির্মলা বাঁচতে পারত—বিয়ের পর থেকেই এক রকম—নির্মলাকে এ-রকম নিস্তার দিতে চেয়েছে সত্যেন, নিস্তার দিতে চাচ্ছে। বুঝেছে যে, এর ভিতর তার নিজেরও নিস্তার; এক-এক সময় খুব আগ্রহের সঙ্গে বুঝে ফেলেছে সত্যেন যে, এর ভিতর তার নিজেরই নিস্তার।

টাকা নেই—চাকরি নেই—চারদিক দিয়ে দায়িত্বের আর শেষ নেই : এই সব নিয়ে হয়তো জীবনের বোঝা নয়; নির্মলাই ভার।

ঘরের ভিতর ঢুকলেই তা টের পাওয়া যায়।

বাইরে গেলেও তা ক্রমে-ক্রমে ছাড়ে; তারপর হেমন্তের মাঠের ভিতর শালিখের হলদে ঠ্যাং, হলুদ ক্যানাফুল, সজনে গাছের হলদে পাতাগুলো, সমস্ত সবুজের সঙ্কল্পের থেকে নিবৃত্ত হয়ে—নরম হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যে নিস্তার পায়—তাই।

কিন্তু জীবন তো শুধু হেমন্ত নিয়ে নয়; বাহির নিয়ে নয়—

—কিছু ধূপ দেবে, নির্মলা, রোজ-রোজ এমন ব্যাং কটকট করছে—আবার কারু অসুখ না হলে হয়

নির্মলা ধূপ দিচ্ছে না; অবিশ্যি কোনও দিনই দেয় নি সে—গেরস্তালি কাজ বড়ো একটা বিশেষ কিছু সে ক'রে না; কিন্তু তবুও যে-কাজ সে করবে না নিশ্চিত, সকলের সুমুখে তাকে তা-ই করতে ব'লে সত্যেন, বেকুবি করেছে কী করে নি, সে-সব ভেবে দেখবার মতো কোনও প্রবৃত্তিই যেন তার হচ্ছে না; যেন বৌকে একটু শাসন করা দরকার; অতিরিক্ত লাই দিয়ে—দিয়েছে সে নিজেই—নির্মলার মাথা খেয়ে ফেলার কিছু বাকি নেই যেন আর—বৌকে কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত : সকলের মাঝখানে মেয়েটার ঠ্যাটামি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—কত বড়ো বেল্লিক সে, সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা জানিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সকলেই তা জানে; ঘরের ভিতর এই চার-পাঁচটি প্রাণীর মুখের দিকে তাকাতেই সত্যেন একটা অত্যন্ত পরিচিত উৎকট কঠিনতায়—ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

এ-রকমই তো হয়ে আসছে।

এদের কঠিনতায় কখনও সে সায় দিয়েছে, বিরক্ত হয়েছে, লজ্জা পেয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, এদের কঠিনতাকে কখনও সে মেনে চলেছে, কর্তব্য বোধ করেছে, আদর করেছে—বা, কঠিন মনে করেছে। আজও এই সবেরই একটা কিছু মনে ক'রে নিতে হবে সত্যেনকে; এর বেশি কী আর করবে সে?

কোনও সঙ্কল্প নেই জীবনে তার, কোনও সাহস নেই; কিছুকেই সে প্রতিরোধ করতে পারে না, প্রতিবাদ করতে পারে না।

নিরুপমা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠেছে—

একটা প্রলয়কাণ্ড কিছু না হয়ে যেন যায় না—অনেক দিনই বৌয়ে-শাশুড়িতে অনেক কিছু হয়ে গেছে; যদিও আজকের ফাঁড়াটা হয়তো খুব সামান্য। কিন্তু, শাশুড়িরা—মাকে অদ্ভুত কঠিন দুর্দান্ত শাশুড়ির রূপেও দেখে নিল সত্যেন—বিবাহ তাকে অনেক জিনিসই দেখাল—ফাঁকই খোঁজে যেন, বড়ো-ছোটর প্রভেদ দেখতে যায় না বড়ো একটা।

টিনিও যেন মাকে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করছে।

ছোট খোকাও যেন বৌদিকে বেশ এক হাত জব্দ হয়ে যেতে দেখলে খুব খানিকটা খুশি হয়।

এই ছোটদের এই রকম আক্রোশ—নির্মলার মতো (সে নির্মলা যা-ই হোক না কেন) বৌদির বিরুদ্ধে অশোভন নয়? অস্বাভাবিক নয়? না ঘাস যেমন ক'রে গজায়, তেমি সহজ।

এদের আক্রোশ ঘাসের মতো সহজে জন্মাচ্ছে,— নির্মলার অস্বস্তি, নির্মলার হাঁপ, জীবনের ভিতর গুমোট—এই দারুণ গুমোট তার—অভক্তি, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, অপমান, জ্বালা, ক্লেশ, গ্লানি—এ-ও ঘাসের মতো সহজে গজাচ্ছে—আশ্বিনের মাঠের ঘাসের মতো; ঘাসের পিছনে যে-অঙ্কুর রয়েছে, তার ভিতরে যে-জিনিস নির্মলার সমস্ত জ্বালাপোড়ানির ভিতরেও, সেই জিনিস সেই জীবন—বাধা পেয়ে বাধা না পেয়ে—দুই দিক দিয়ে দু'-রকম ভাবে ফুটে উঠছে—বধূকে একটু নিস্তার দিলেই ঘাস নক্ষত্র প্রজাপতি ফড়িং এমন-কি নিরুপমার সঙ্গেও তার গভীর আত্মীয়তা ধরা প'ড়ে যাবে; কারণ, নিরুপমার জীবনে বাধা নেই—ভালোবাসা আছে, নির্ভর আছে, দারিদ্র্য থাকলেও বিশ্বাস আছে জীবনের উপর। নির্মলাও অপেক্ষা করছে এ-সমস্তেরই জন্য—কিন্তু এখানে নয়; আর কোথাও।

কিন্তু ছোটরা তো দূরের কথা, নিরুপমাও এ-সব বুঝবে না; বৌয়ের কোথায় খটকা, কোন জীবন কীসের ভরসা রাখে, কীসেরই-বা রাখে না, কোনও মানুষকে কেন পশু মনে হয়, তাকে কেন এমন নিরর্থক ঠ্যাকে, খুব কম শাশুড়িই—কোনও শাশুড়িই কি?—এ-সব কথা ভাবতে যায়; ভেবে-ভেবেও কিছু বুঝতে পারে না; অবিশ্যি শিক্ষাদীক্ষা হ'লেই সব সময় যে সব কিছু বোঝা যায়, তা-ও নয়—কিন্তু, তবুও—সত্যেনের অনেক সময়ই মনে হয়েছে—এরা যদি আর একটু শিখত : এই শাশুড়িরা; এরা আর একটু বুঝত যদি।

জীবনকে বুঝবার অভাবেই নির্মলাকে মা আজ অনেকখানি ঠাসল; ধর্মদাসবাবু অনেক ক্ষণ পর চ'লে গিয়েছেন, কিন্তু ধূপ দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ছোটদের সামনেই—আধঘণ্টারও উপরে হতে চলল মা নির্মলার উপর সব রকম নিষ্ঠুরতাই করল।

কিন্তু কী করবে—সত্যেনের কোনও হাত নেই।

ধর্মদাসবাবুরও না।

জীবনীশক্তি নিরুপমারই সব-চেয়ে বেশি, কারণ, মনের ভিতর তার কোনও দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা নেই আর; সবই সেধে ফেলেছে সে; ভগবানের উপর—জীবনের উপর তার বিশ্বাসের শেষ নেই; ধর্মের উপর, ন্যায়ের উপর।

স্বামীকেও সে ভালোবাসে—কে জানে ধর্মদাসবাবু সেই প্রেমের কত দূর কী ঠিক ক'রে উঠেছেন, চারদিককার খটকাগুলোরও কত দূর কী মীমাংসা ক'রে ফেলেছেন।

ধর্মদাসবাবুর মীমাংসা বিশেষ কিছু হয় নি ব'লেই মনে হয়; বধূকে উৎপীড়ন করার ভিতর—এমন-কী একটা ইঁদুর মেরেও ছেলেরা যে-আনন্দ পায়, এ-সবের ভিতর তিনি কোনও দিন নেই; কিন্তু সে-সব নিষ্ঠুরতার আমোদে বাদ সাধতেও বড়ো একটা যান না তিনি; দূরে থাকেন, এই মাত্র।

বাবার জীবন এই রকম। নানা রকম সন্দেহ নিয়ে রয়েছেন যে—এই জীবনের ছোট-বড়ো নানা রকম সমস্যা সাধতে গিয়ে—এক সময়ে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বটে।

প্রায়ই মনে হয়, ধর্মদাসবাবুর জীবনে একটা বিশ্বাস আছে নিশ্চয়ই—বিবেকের প্রতি, বিচারের প্রতি, নিয়মের প্রতি, মঙ্গলের উপর, ভগবানের উপর, প্রেমের উপর।

কিন্তু তবুও যতটা মনে হয়—ততটা ঠিক নয়। কিছুটা সমাধান হয়েছে এর—অনেক কিছু সমাধান হয় নি? তা-ও নয়; অনেক কিছুই যেন সমাধান হয়েছে—কিন্তু তবুও একটু কিছু বাকি রয়েছে; কিন্তু সেইটুকুই অনেককে এমনি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে যে, বেশি কাজ—বেশি কথা—বেশি প্রতিজ্ঞা—বেশি সাহস—বেশি সঙ্কল্প—বেশি প্রচার—বেশি বিশ্বাস—বেশি ভালোবাসা এঁকে রেহাই দিয়েছে; ধর্মদাসবাবুর সংসারের জীবনটা অনেকখানি পঙ্গু হয়ে গেছে তাই।

কিন্তু সত্যেনের মনে হয়, ভালোই হয়েছে। এ ছাড়া কী আর হতে পারত? অন্তত নিরুপমার থেকে ঢের ভালো—যদিও নিরুপমা ঢের বেশি পজিটিভ। নিরুপমার মতো মনোবৃত্তির পুরুষমানুষরাই কাজের লোক হয়—একটা সংসারকে কিম্বা একটা স্টেটকেই চালায়।

সত্যেন আর ধর্মদাস দু'জনেই অকেজো।

ধর্মদাস বেরিয়ে গেছেন।

সত্যেন বাইরের ঘরে ব'সে রয়েছে।

নির্মলার কত দূর কী হয়েছে সবই বুঝতে পারছে সে; কিন্তু কী করতে পারা যায়—আজকের এই ব্যাপারটা নিয়েই নয় শুধু—নির্মলা বা নিরুপমাকে নিয়েও নয়—এই সমস্ত জীবনটাকেই তার নিয়ে, এই অদ্ভুত গোলকধাঁধার ভিতর আজ সে হারিয়ে গেছে;—রোজই অজস্র বার ক'রে যেমন সে হারায়—তারপর ধাঁধাটাকে সরিয়ে দিয়ে, জীবনটাকে স্থগিত রেখে কোনও মীমাংসা ক'রে নয়, যেমন সে চুপ ক'রে থাকে—রোজই অজস্র বার ক'রে।

এই রকম জীবন একঘেয়েই শুধু নয়—বড়ো একা; কুড়ুলের মতো এ কাটতে চাচ্ছে শুধু, কিন্তু তবুও গভীর জঙ্গলের ছবি দেখে অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

কলকাতায় যখন নানা রকম কাজের ব্যস্ততায় ছিল সত্যেন, মনে হ'ত একটা গাছই জঙ্গলটাকে তৈরি করেছে; —প্রশ্নের ভিতর ঢের উৎসাহ ছিল তাই তখন, ঢের উত্তেজনা; কারণ, প্রশ্নের উত্তর চিন্তায় মিলত না—কাজে; আজ এই নিষ্ক্রিয়তার ভিতর এসে জঙ্গলটাতে অজস্র গাছ বুদ্ধিকে চমকে দিচ্ছে; আইডিয়া আজ খোরাক পাচ্ছে শুধু—কাজের কোদালে-কুড়ুলে পিষে যাচ্ছে না।

কিন্তু আইডিয়ার ভিতর কোনও উত্তেজনা উৎসাহ নেই কাজের ভিতর যা আছে? কলকাতায় যা ছিল?

মাথাটাও—বা জীবনটা এমন কিছু গভীর নয় যে, আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ

করবে; কৌতূহলের দু'-চারটে ছুটকো আমোদ আনছে মাত্র; জীবনের সব দুধ—ঢের দুধ রয়ে গেছে না কি জীবনের ভিতর?—একটা কেউটের মুখের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে বিষ ক'রে ফেলছে যেন।

শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়াতে হেমন্তের সন্ধ্যাটা কেটে গেল—প্রথম রাতটাও। রাত আরও বেড়ে যাচ্ছে।

ধর্মদাসবাবু বাড়িতে ফিরে এসেছেন; হেমন্তই তো শীত;—দেশের বাড়ির মানুষ শীতের পথে বেশি বেড়োায় না, বেশি জাগে না শীতের রাতে। ঘরের ভিতরের কাজকর্ম সব শেষ হয়ে গেছে; খাওয়াদাওয়ার শেষে এখন সমস্ত বাড়িটা ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

নির্মলা যে খায় নি, সত্যেন তা না দেখেও জানে; এম্নিই তাকে খাওয়ানো ঢের শক্ত,—একটা টোকা দিলেও কেরার মতো গুটিয়ে পড়ে সে, আর এমনতর রাতে—

মা'ও খায় নি হয়তো; সত্যেন নিজেও খায় নি—বধূ তাকে কোনও দিন সাধতে আসে না বটে—অন্তত ধর্মদাসবাবু সকলের জন্যই অল্প-সল্প জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেন।

কিন্তু আজ কোথাও কেউ নেই যেন; কারুর জন্য কারু কোনও গরজ নেই; প্রত্যেকেই হয়তো প্রত্যেককে অবহেলিত বোধ করছে; নিরুপমা হয়তো বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে ভাবছে যে, সে তার নিজের কর্তব্য করেছে ব'লেই কি সবাই তাকে ত্যাগ করেছে? সবাই অনাদর করছে তাকে, উপেক্ষা করছে তারই জন্য? অপমান করছে?

নিরুপমা এই রকমই ভাবে।

কিন্তু তবুও কর্তব্য—দায়িত্ব—বিশ্বাস এই সব গভীর-গভীর জিনিস তাকে খানিকটা আশ্বাস দেয়।

ধর্মদাসও একা-একা তাঁর বিছানায় শুয়ে নিরুপমার প্রেমের কোনও মানে বুঝছেন না : প্রেম—যে-প্রেম স্বামীকেও অন্তত এসে জিজ্ঞাসাও করে না : কিছু খাবে কি না—সে-জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজনও বোধ করে না; নিরুপমার কর্তব্যেরও কোনও মানে বুঝছেন না—যে-কর্তব্য মেয়ের উপর নিষ্ঠুর হয়েই—সেইটেই যথেষ্ট খারাপ—শোধ হয়ে যায় না, পরের মেয়েকে ক্ষমা করা তো দূরের কথা—তার সামান্য ত্রুটির উপর নিষ্ঠুরতর হয়ে ওঠে।

সামান্য ত্রুটি নয় কী? অত্যন্ত তুচ্ছ একটা অপরাধ মাত্র; ধর্মদাস আগাগোড়া লক্ষ ক'রে দেখেন নি কি?

সত্যেনের মতো অতটা গভীর ভাবে না বুঝলেও বুঝেছেন ধর্মদাস যে, এই পরিবারের এমনতর জীবনের ভিতরে এসে বধূর বিশেষ কোনও দোষ নেই। নিজে তিনি অবিশ্যি ঢের সহিষ্ণু হয়ে সহ্য ক'রে এসেছেন এখানকার এই জীবনটাকে অনেক দিন ধ'রে।

কিন্তু তবুও সহ্য করবার আগে ঢের উপলব্ধি ক'রে নিতে হয়েছিল; সেই জন্য ঢের

চেষ্টা চলেছিল—সময় লেগেছিল, পুরুষমানুষের-সাধনার ঢের প্রয়োজন হয়েছিল—ভাগলপুরের টালির বাংলোর নিয়মে আরামে সফলতার ভিতরে রয়েছে যে আঠারো বছর সেই যুবতীর কাছ থেকে নিরুপমা তা-ই আশা করে, হায়!

এই মেয়েমানুষরা জীবনটাকে এত কম বোঝে!

এত বেশি চায় জীবনের কাছ থেকে এরা!

কী গভীর সাধ এদের!

জীবনের দুঃখ কষ্ট অভাব গ্লানির অভিজ্ঞতা এক হাজার বার ক'রে এদের কান মুচড়ে দিলেও পরমুহূর্তেই আর এক বার কান ম'লে ছিঁড়ে দেবার প্রয়োজন আসে; কিন্তু তবুও বোধ হয় না।

আজ খানিকটা রাত অব্দি বেড়িয়েও খিদের কোনও প্রয়োজন বোধ করছেন না ধর্মদাসবাবু; সে-দোষ পেটের নয়—রুচিরও নয়—কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতা উপেক্ষা অবহেলাগুলো প্রাণের যেই জায়গায় গিয়ে আঘাত করে দোষটা সেখানকার।

আগাগোড়া ভেবে দেখলে, বিছানায় প'ড়ে থেকে—আজ রাতে এই (অনেক রাতেরই মতন) নিজেকে ঢের উপেক্ষিত ব'লে মনে হতে পারে;—অবহেলিত উপেক্ষিত অনাদৃত একটা জীব ব'লে; কেউ কি তাঁকে চায়? তাঁর কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু এগুলো নিতান্ত তুচ্ছ—নিজের সম্পর্কের কথা; অত্যন্ত অভিমানের কথা এগুলো; অভিমান বরাবরই ফেনার মতো ফানুসের মতো একটা কিছু—অভিজ্ঞতার সামান্য একটা কাঁটার খোঁচায়ও তা ফুঁড়ে যায়, কোনও মানে থাকে না তার; নিজের জীবনটাকে শিক্ষাদীক্ষার অভিজ্ঞতার সহস্র ছুরির-ফলা ব'লে মনে হয় না কি তাঁর?

সে-জীবনের ভিতর, হায়, অভিমানের জায়গা কোথায়!

অভিমান নয়—নিজেকে নিতান্ত একা বোধ হচ্ছে ধর্মদাসবাবুর।

সত্যেনের মনে হচ্ছে ধর্মদাসবাবুর চেয়েও জীবনে ঢের বেশি বঞ্চিত হ'লেও অনেক আগেই সে অভিমান অপমানকে টপকে গেছে যেন; কার উপর সে অভিমান করবে? নির্মলার উপর পারল না—নিরুপমার উপর না; পৃথিবীর মেয়েদের মতো এরা পুরুষকেই—সে স্বামীই হোক, ছেলে হোক, পিতা হোক, প্রেমিক হোক—পুরুষকেই আগে শিকার ক'রে নেয়; (তা না ক'রে হবেই-বা কী?); এরা নির্ভর চায় যে সব-চেয়ে বেশি ক'রে, শৃঙ্খলা চায়, ঘর-গোছগাছ চায়; (সেখানে) জিজ্ঞাসা-সন্দেহের কুড়ুল দিয়ে জীবনের ফোঁপরা কাঠগুলোকেও এরা ফাড়তে চায় না; আশ্রয় চায়—যে-কোনও নির্ভর হ'লেই হ'ল—সমস্ত অভিমানের গাঁট্টি যে-কোনও মানুষের ঘাড়ে চাপিয়েই নির্ভর; এম্নি ক'রেই সব।

কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজের ঘাড় নিজের জিনিসের জন্য—পরের জিনিস কুলি ছাড়া কেউ নেয় কি? পরের চুমোটুকু অব্দি?—এমনই খারাপ সময় পড়েছে; প্রেমিক বরং অইটুকু নিতে পারে—কিন্তু মেয়েমানুষের অভিমান চোখের জল তবুও হাজার মাথা হাজার হৃদয়কে বোঝাই ক'রে দিয়ে তারপর মেয়েমানুষকে শান্ত করে—তাকে বুঝতে

দেয় না যে বালিশে আটকে রয়েছে শুধু, বোঝা তার চকিটাকেই বোঝাই করছে, তার শরীরটাকেই বোঝার ভারে ঢাউস ক'রে ফেলেছে যেন, আর কিছু করে নি;

সত্য শুধু তার হৃদয়ের মেয়েমানুষের অভিমান এবং সেই অভিমানের নিবৃত্তির নরম নিয়মটুকু।

হায়, নরম নিয়মটুকু এই মেয়েমানুষের; এই নিয়ে নিরুপমা খানিকটা শান্তি পাচ্ছে—নির্মলা পাচ্ছে; খানিকটা; পৃথিবীর সমস্ত অবহেলিত অপমানিত মেয়েমানুষরাই; আজ রাতে; পিছনের কোটি রাতের মতো, সমুখের কোটি-কোটি রাতের মতো।

এম্নি ক'রে রাত চলেছে—পৃথিবীর, নির্মলা নিরুপমা ধর্মদাস সত্যেনের। শীতের রাত ঢের বড়ো।

কিন্তু আজ রাতে সবাই জেগে রয়েছে।

পরিবারের ভিতর সচ্ছলতা তো মোটেই নেই—কিন্তু তবুও ভাতগুলো নষ্ট হয়ে প'ড়ে রয়েছে; ইঁদুর বিড়াল কুকুর—রান্নাঘরে একে-একে সবাই ঢুকছে; মানুষ না খাক—এরা নিশ্চয়ই খাবে। তা না হ'লে বাঁচবার উপায় নেই; বাঁচবার উপায় নেই। নির্মলা নিরুপমার মতন কোনও অভিমান অপমান বা ধর্মদাস সত্যেনের মতো কোনও বিবেক-বিচারের পয়েন্ট নিয়ে এরা একটা মুহূর্তকেও নষ্ট ক'রে দিতে পারে না।

আর এই মানুষ ক'টি একটা রাতকেই দিচ্ছে নষ্ট ক'রে; কিন্তু একটা রাতকেই কি শুধু? অনেক দিনই এমন নষ্ট হয়ে গেছে; আরও অনেক দিন হবে।

অথচ এদের কেউই অসৎ বা নোংরা লোক মোটেই নয়,—বাস্তবিকই নিষ্ঠুর নয়; আহ্লাদ সঙ্কল্প সাধ সাহস স্বপ্ন প্রেম—কিম্বা বোধ বিবেক বিচার—এই সবের চেয়ে গভীর জিনিস কোনও মানুষই আশা করতে পারে না—এই সবই এদের রয়েছে না কি?

সবই তো আছে; কিন্তু তবুও এমন হয়? সমস্ত রাত ভ'রে প্রত্যেকেই নিরর্থক—কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারছে না।

রাত আরও গভীর হয়ে গেছে—আরও গভীর; নিতান্ত শরীরের অবসাদেই এখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে ; মনের চেয়ে রক্তমাংসের দরকারটাই এখন যেন ঢের বেশি; ঘুমটা খিমচেই ধরেছিল সত্যেনকে—কিন্তু কখন? হঠাৎ বেঙ্গির (সত্যেন-নির্মলার ছ'মাসের মেয়ে) চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে—বাবা রে, সে কী চিৎকার! মেয়েটাকে যেন কেউ—কিন্তু বেঙ্গি ঐ রকমই; বিশেষ কিছু নয়—ওর খিদে পেয়েছে, এই মাত্র। ফুড তৈরি করতে হবে—কিন্তু নিরুপমা সে-সবের ভিতরে আজ আর স্রেফ নেই; নির্মলা এখন সত্যেনের সাহায্যও পেতে পারে না; মেয়েটা কি সারা রাত ধ'রে চেঁচাবে তাহ'লে? মুখে রক্ত তুলে মারা যাবে? সত্যেন বিছানার উপর উঠে বসেছে।

বোতলে স্পিরিট ছিল না—আনাও হয় নি—কেই-বা স্টোভ জ্বালাবে, কী ক'রেই-বা?

জানালার ভিতর দিয়ে নির্মলাকে দেখা যাচ্ছে; তোলা-উনুনটা রান্নাঘরের থেকে নিয়ে এসেছে কোন এক ফাঁকে; উনুনটা জ্বালছে।

এই সব?

আগুনের আলোয় নির্মলার নিখুঁত মুখখানা টক্‌টক্‌ করছে—নিখুঁত নিটোল মুখখানা তার; এ নির্মলা নয়, সত্যেনের বধূ নয়, সত্যেনের সঙ্গে এর সমস্ত সম্পর্কের সংস্কার মনের থেকে নামিয়ে নিয়ে মুখখানার দিকে তাকাতেই বিষম ক্ষুধা জেগে ওঠে; বিয়ের পরে পাঁচ-সাতটা রাতের সেই এক ক্ষুধা;

এম্নি সুন্দরকেই সে তো চেয়েছিল; চেয়ে—পেয়েওছিল বটে; কিন্তু তবুও আজ আর চায় না; সৌন্দর্যের ঢের হয়ে গেছে জীবনে; মেয়েমানুষের মনের প্রখরতার আস্বাদও মিটে গেছে একেবারে—শরীরের—ক্ষুধার তৃপ্তির আগেই যেন;নারীর বড়ো-বড়ো জিনিসগুলোকে—যা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী পাগল—দিয়েছে পচার ক'রে সত্যেন।

মেয়েমানুষের কাছ থেকে কিছু আর চায় না সত্যেন

কিম্বা এমন কিছু চায় যা ঢের সাধারণ

সত্যেন হয়তো একটা জানোয়ার—একটা গণ্ডার গাড়ল; কিন্তু তবুও এটা সে বুঝছে যে, যে-কারণেই হোক না কেন—যে-জিনিসের কোনওই দাম নেই তার কাছে আজ, সেই জিনিসই পৃথিবীর বাজারে বড়ো দুর্মূল্যে বিকোয় : এ-পরিবার এ-স্বামী মোটেই নির্মলার উপযুক্ত হয় নি—এক-একটা বিয়ে শুধু টিটকারি মাত্র; কোনও বিয়েরই কোনও মানে নেই, কোনও বিয়েতেই সত্যেনের কিছু হত না। নির্মলারও কিছু হত না। যে যার খুশি বর হয়ে বসে, যে যার খুশি কনে হয়; পরিকে উল্লুক এসে গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে, ঔরসের সন্তান জন্মায়—; উল্লুকি গন্ধর্বের সাথে-সাথে জোড় বাঁধে, কেউ বাধা দেয় না—কুকুর বা ঘোড়ার বেলা যা সত্যি মানুষের বেলা সেইটুকুও সত্যি নয়... কিন্তু খানিকটা নিয়ম, একটু শৃঙ্খলাও যদি পৃথিবীর থেকে বের করা যেত, তাহ'লে নির্মলার উপযুক্ত এমন পরিবার ও স্বামীর হাতেই সে পড়তে পারত যে নির্মলাকে বিয়ে ক'রে নির্মলার মৃত্যুর পর আবার যদি সেই স্বামীর বিবাহের প্রয়োজন হত তা হ'লে নির্মলার সোনার মূর্তি ছাড়া আর কিছুকেই সে বিবাহ করতে যেত না; বাস্তবিকই এই মেয়েটির এতখানিই দাম।

এক জন কী দু' জন শুধু? দেশের ভিতর এমন হাজার-হাজার স্বামী রয়েছে এই মেয়েটির এই গুণকে—আহা, এই রূপকেই শুধু—এইটুকু শ্রদ্ধা জন্ম-জন্ম ভ'রে জানাতে পারত। পারত না?

যদিও সত্যেন নির্মলাকেই শুধু নয়—কোনও মেয়েকে নিয়েই সে-সব কিছু করতে পারত না; কোনও মেয়েরই স্বামী হবার উপযুক্ত নয় সে; সে স্বামী নয়—পুরুষমানুষ মাত্র; হয়তো তা-ও নয়; কেবল জিজ্ঞাসার সমষ্টি, সন্দেহের; অনুভবের সমষ্টি সে শুধু; আর্টিস্ট? তা-ও কি?

কিন্তু পৃথিবীতে হাজার-হাজার স্বামী রয়েছে—নির্মলার উপযুক্ত শত-শত স্বামী রয়ে গেছে।

নির্মলাকে তারা এইটুকু শুধু নয়—এর চেয়ে ঢের বেশি দিত তারা। সে-সব ভাবতে

পারা যায়—বধূর এই আজকের জীবনের এই বেঙ্গি এই তোলা-উনুন—এই নিরুপমা—এই সত্যেন—এন্নিতর পরিবার ঘর—এই রাত এই হিম এই সমস্ত সত্যের আন্তরিক শ্লেষ সত্যেনের (সহিষ্ণুতার জিজ্ঞাসার অনুভবের অপেক্ষার) বরফের মতো হৃদয়কেও যেন আরও হিম ক'রে দিচ্ছে; শীতের যেন আর শেষ নেই কোথাও।

তোলা-উনুন নিভে গেছে।

বেঙ্গির চেঁচামেচিরও আর কোনও সাড়া নেই; মেয়েটা দুধের বোতল পেয়ে গেছে। এই মেয়েটির সম্বন্ধে নির্মলা কী ভাবে?

রাত তিনটের সময় দুধের বোতল হাতে ক'রে কীই-বা ভাবছে সে? ভাবাভাবি নিয়ে নির্মলা সত্যেনের সঙ্গে বিশেষ কোনও সম্পর্ক রাখে না—কোনও দিক দিয়েই না; বধূর বুকের ভিতরটাকে অনুমান ক'রে নিতে হয়—সে-অনুমান একেবারে মিথ্যে নয়; শুধু গুমোট দিয়েই কি নির্মলার আজকের জীবনটা গড়া? শুধু দাঁতকপাটি দিয়ে—ঠোঁটচাপা সহিষ্ণুতার পিছনে যে-উত্তেজনার ইস্টিম থাকে—ছেড়ে দিলে এক-একটা জীবনকে যা আকাশে-আকাশে উড়িয়ে নিতে পারে তা-ই দিয়ে শুধু!

অনেকখানি তা-ই; কিন্তু তবুও সত্যেনও কি স্বামী হতে পারে না? দরকার হ'লে নির্মলার সোনার মূর্তি গ'ড়ে সেটাকেও বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—অতখানি নয়; কিন্তু তবুও এই রক্তমাংসের আশা সাধ সঙ্কল্প শৃঙ্খলার মেয়েমানুষটিকে নিয়ে তাকে তৃপ্ত ক'রে রাখবার জন্য অন্তত স্বামী-স্বামী খেলতে পারে না?

এর ভিতর মিথ্যা থাকতে পারে, কিন্তু মিথ্যার খেলায় সত্যের নেশাও তো লেগে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত।

ভবিষ্যতে যে কী হয় কেউ কিছু বলতে পারে না; আর্টিস্ট—সে স্বামী হয়ে যেতে পারে; সারা জীবনের স্বামী-মানুষটিও ঠাণ্ডা আর্টিস্টে দাঁড়াতে পারে গিয়ে।

নির্মলাকে যখন সোনার সীতার-রামের হাতে—যদি নির্মলা নিজে তাকে খুঁজে না বের করে—কিছুতেই তুলে দিতে পারা যাবে না, তখন সত্যেনের নিজেরই চেষ্টা করা উচিত নয় কিছু পরিমাণে তেমনি একটা-কিছু হতে শুরু করা; দায়িত্ব তো তার এই মেয়েমানুষটির জ্বালাপোড়ানির হাপরটাকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে আনবার? আচ্ছা, তা-ই করা যাক—করতে চেষ্টা করা যাক; কিন্তু যা-ই করুক না কেন সত্যেন যেন স্টেজম্যানেজ না করতে যায়—জিনিসটা যেন আন্তরিক হয়—ঘাসের জীবনের মতো।

কিন্তু সত্যেনকে দিয়ে এই জিনিস সম্পর্কে তা কি কখনও হবে? এত বার জিজ্ঞাসা আন্তরিকতা সে কোথায় পাবে? খেলা মাত্র—ভান শুধু, পাখির মতো মিটমাট-বাঁধা মন নিয়ে নীড় তৈরি করবার মতো স্থিরতা সত্যেনের জীবন কোনও দিন পাবে কি?

পায় তো ভালো; না পায় যদি—তবুও ভালো; কারণ, ভানই হোক, আর সত্যই হোক, দু'টোর ভিতরেই যখন অনুভব থাকবে বোধ থাকবে—দু'টোই ভালো। আরম্ভ ক'রে দেখা যাক্—যা-হয় একটা কিছু; নিষ্ক্রিয়তাই খারাপ,—আর্টিস্টকে ভেঙে স্বামী হবার চেষ্টা—মন্দ কী? স্বামীকে ভেঙে আর্টিস্ট হবার চেষ্টা—তা-ও মন্দ কী;

দু'টোতেই জীবন নতুন জিনিস পাচ্ছে; হয়তো শেষ পর্যন্ত ভাঙছে না কিছুই—একটার সঙ্গে আর একটা জোড় খাচ্ছে শুধু।

ভোর হয়ে গেছে।

নিরুপমা কালকের নোংরা বাসনগুলো মেজে ফেলে উনুন জ্বালবার চেষ্টায় আছে; ধর্মদাসবাবু ভোর ফিরতে গেছেন; সত্যেনের এক কাপ চা পেলে হত; কিন্তু নির্মলাকে বলবার সাহস নেই—হয়তো জ্ব'লে উঠবে।

কিন্তু তবুও—খেলাটা আরম্ভ করতে তো হবে; আজ থেকেই।

নির্মলা শাড়ি-শেমিজগুলো সমস্ত গুনছে—বালিশের অড়গুলি অব্দি; কোথায় কী খাক্‌তি পড়েছে যেন—সেই জন্য কেমন উসখুস—একটু ছনছন্; কালকে রাতে শাশুড়ির কথাগুলো—শেষ পর্যন্ত বাতাস মাত্র; কিন্তু বালিশের অড়—শত নোংরা হ'লেও—একটা জিনিস বটে; একটা অড় হারিয়ে গেছে বোধ করি।

—কী রকম অড়, নির্মলা?

কোনও জবাব দিচ্ছে না।

—আচ্ছা, ফ্রিল-দেওয়া?

সত্যেনের দিকে এক বার তাকাচ্ছে নির্মলা—কটমট ক'রে—পারে তো মানুষটাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে; কিন্তু তবুও—তাকিয়েছে তো—

—একটা অড়ের উপরে রেশমি সুতো দিয়ে তুমি যে ফুল কেটেছিলে—

গুলি লাগছে না।

কাপড়চোপড় ধোবাবাড়ি দেবে—সেই জন্য এই অড় খোঁজা; কালকের রাতের পর আজকের ভোরের এই নিদারুণ খুঁটিনাটি : দু'-এক জন এই নিয়ে একটা শোকের গল্প তৈরি করতে চায়—কিম্বা একটা ঠাট্টার; এই ঠাট্টাটা যে-জীবন দিয়েছে সে নিবৃত্তি দেয় নি; খাঁচার ভিতরে ইঁদুর এক হাজার বার দরজার খোঁজে ঘুরলেও আরও এক হাজার বার দরজার খোঁজে ঘুরবে—তাকে টুকরো-টুকরো রুটি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখো, সে আরও হাজার-হাজার বার দরজা খুঁজে ঘুরবে—জীবনের শেষ পর্যন্ত; কিন্তু তবুও জীবনের শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে খুদ খুঁটে নেবে,—হায়!

নির্মলা ধোবার হিসেবের খাতায় কাপড়ের হিসেব সেরে ফেলছে, ধোবার জন্য বোঁচকা বেঁধে রেখেছে!

ঘরটাকে গুছোচ্ছে সে।

সেইফটি-পিন কয়টা গুনে দেখছে।

একটা সেইফটি-পিন হয়তো হারিয়ে গেছে—কোথায় সেটাকে পাওয়া যায় খুঁজছে নির্মলা।

নির্মলাকে এখন একা থাকতে দেওয়াই ভালো।

নিজের মনের ভিতরও সত্যেনের বিশেষ কোনও আগ্রহ জ'মে উঠছে না; এই রূপ তাকে স্পর্শ করছে না—পৃথিবীর সমস্ত মেয়েমানুষের রূপই যেন ফতুর-করা এই

রূপের ভিতর দিয়ে ফাক্কা হয়ে গেছে; রূপের কোনও মানে নেই; রূপ যেন ঢিলের মতো, খোসার মতো, পাথরকুচি পাতার মতো, মাঠের কুকুর-শোঁকা গাছগুলোর মতো। লালসা-লাম্পট্যের পথ দিয়েও নির্মলা অর্থহীন; একটা রবারের পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কী দিয়ে সত্যেনকে আকৃষ্ট করবে সে? কী দিয়ে বাঁধবে? নির্মলার সঙ্কল্প, সাহস, শৃঙ্খলা—নির্ভর—কিছুই ধরছে না আজ সত্যেনকে?

কী দারুণ অবসাদ সত্যেনের জীবনে এসেছে : ভাবতে গেলে চমকে উঠতে হয়; অবসাদের কী দারুণ নিষ্ঠুরতা! সত্যেন নির্মলার ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই স্বামীর নিষ্ঠুরতার ধ্বকে নির্মলা যেন দগ্ধ হয়ে গেছে। নিরুপমার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল তফাত যেন।

জীবনের অবসাদ—জীবনের নিবৃত্তি—জীবনের হেমন্তের শীতের গভীর নিষ্ঠুরতা এই।

কোনও গল্প—কবিতা—কল্পনা,—কোনও করুণাও যেন একে নরম করতে পারবে না; কিম্বা হয়তো দুই মুহূর্তের জন্য নরম করতে পারে শুধু; কিন্তু তারপর আর কোনও সঙ্কল্প থাকে না—সাধ থাকে না কিছু—থাকে অবসাদ—নিরাভরণ অঘ্রাণ—কুয়াশা—শীত—

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৩৪
পাণ্ডুলিপির ২-সংখ্যক পৃষ্ঠায়
গল্পের নামকরণের এ-রকম
একটা ইঙ্গিত আছে :
autumnal tale

সেই শীতের রাতগুলি

এই সবের জন্যই—সব-চেয়ে আগে ভগবানের কাছেই তারা বিশেষ ভাবে ঋণী।

প্রিন্সিপাল বলছেন : আমাদের কলেজের উপর ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু শশাঙ্ক যদি কলেজটির প্রিন্সিপাল হত তা হ'লে এ-ব্যাপারটার আগাগোড়া সমস্ত কিছুকে সে যে অন্য এক রকম ক'রে ধরত—সে অন্য এক লোক ব'লে—তা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রতিটি আলাদা লোকই তার নিজের মতন ক'রে জিনিসগুলোকে বুঝে নেয়।

কিন্তু কোনও একটা জীবনের বা ব্যাপারের বা ইনস্টিটিউশনের উপর বিশেষ দয়া বা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতায় অনেকেরই হৃদয় প্রায় ভ'রে ওঠে।

কিন্তু তার কলেজের (যদি শশাঙ্ক কলেজের প্রিন্সিপাল হত) বা জীবনের কোনও শুভ দিন আসলেও নিজেকে বা নিজের জিনিসকে শশাঙ্ক কারু বিশেষ তরফের বা আদরের ব'লে মনে করতে পারে না। দুঃখ বা সহিষ্ণুতার দিন হঠাৎ স'রে গেল—এ-জিনিসটা কিছুই প্রমাণ করে না। এতে বিহ্বল হয়ে পড়বার কিছুই নেই। সকলের দিকে তাকাতে হয়—তারপর সহিষ্ণুতা, অপেক্ষা ও আঘাতগুলোর দিকে। বুঝতে হয় যে ক্রমে-ক্রমে আঘাতের পর আঘাত না পেলে বা সহিষ্ণুতা বা অপেক্ষাকে না জানতে পারলে জীবনটা নানা রকম আস্বাদেই খাটো হয়ে গেল—নানা রকম অভিজ্ঞতায়।

বুঝতে হয় যে জীবনটাকে যে বাস্তবিকই যাপতে চায় জীবনের এ-সব স্বাদ তার পক্ষে বাস্তবিকই মারাত্মক।

মেয়েমানুষের ছবি দেখেই প্রিন্সিপাল মেয়েমানুষের আস্বাদ আঘ্রাণ জীবনে বুঝে নেয় নি—রক্তমাংসের একটিকে কাছে নিয়ে তারপর স্ত্রীলোককে বুঝতে আরম্ভ করেছে। নইলে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রিন্সিপাল কিছু জানতই না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতা তার মাটি হয়ে যেত—একটা আস্বাদ।

•

তবে দুর্ঘটনা ও দুঃখের বেলায় এগুলোকে এড়াতে চায় কেন প্রিন্সিপাল?

মনে করে কেন জীবনের দুরবস্থা ও দুঃখ মেয়েমানুষের মাংসের (আজও যে-জিনিসটার থেকে নিজেকে একেবারে খ'সে পড়তে দেখতে পারল না সে) চেয়েও হেয়?

গল্প (৬) [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible] . . . [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

~~[illegible]~~

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] – ৭ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible]।

কিন্তু দুঃখ ও দুরবস্থা—মেয়েমানুষের দেওয়া-না-দেওয়ার চেয়েও সেগুলো হয়তো বেশি কিছু দিতে পারে।

অথচ প্রিন্সিপাল তার স্ত্রীর জন্মদিনে তার স্ত্রীর দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করে এবং সেই সঙ্গেই দুর্দশা এবং দুর্ঘটনাগুলোকে চ'লে যেতে বলে।

ভগবান দুই-ই শোনে।

ভগবান দুই-ই করে।

প্রিন্সিপাল তার জীবনে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ পায়।

চারতলার ছাদের থেকে দোতলার এক ঘরে নেমে এসেছে শশাঙ্ক। এই ঘরে আগে কয়লা থাকত। কয়লার ব্যবসা করবার সাধ হয়েছিল এক বার ম্যানেজারের। আজকাল শশাঙ্ক থাকছে; কয়েকটি ধাড়ি ইঁদুরও আছে, কিন্তু দুরমুজ দিয়ে দেবে না-কি সে সেগুলোকে একেবারে লোপাট ক'রে?

কিন্তু মনে হয় এদের চোখ-মুখ লেপে-পুছে গেছে—লোম খ'সে প'ড়ে গেছে সব। এগুলো যেন কাদের বুড়ো বাবারা সব; এদের রগড়ের দিন চ'লে গিয়েছে সব—এখন এদের নিরিবিলি একটু মরতে দাও।

শশাঙ্কের জন্য এ-ঘরখানার সমস্ত গুদাম আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঝাড়াঝাপটা—একটা চকি ও একটা বাক্স ছাড়া পৃথিবীর কোনও জিনিসই আর এখানে নেই

কয়লার টনিক গন্ধ আছে—ঘরে বাতাস নাই-বা এল—শীতের দিনে শীতের রাতে সে-জিনিসের কোনও দরকার নেই; যেটুকু আলো আছে তাতেই হবে। এই ঘরটার সব-চেয়ে সুবিধা এই যে এটার জন্য পয়সা শশাঙ্ককে অনেকটা কম দিতে হবে—এই সুবিধাটার জন্যই শুধু এ-ঘরখানাকে সে নিয়েছে যদিও, চকির উপর নিঝঝুম শুয়ে থাকতে-থাকতে কয়লার গুঁড়ো ও গন্ধে হঠাৎ মনে হতে থাকে যেন সে কোনও একটা চিতার উপর শুয়ে আছে : গভীর রাতের অন্ধকারে এই আস্বাদটা ভালো ক'রে বুঝতে পারা যায়; এই আস্বাদটা ভালো লাগে।

যেন মানুষটার ঠাণ্ডা ছাই সব প'ড়ে আছে,—মানুষটাকে তোমরা আর খুঁজে পাবে না।

জীবনের—কিম্বা মৃত্যুরই—একটা ঘুপসির ভিতর আটকে থেকে খাওয়া-পরা টাকা কর্তব্য বিচার চেষ্টা আস্বাদ ভালোবাসা সাহিত্য লেখা কোনও কিছুরই কোনও অর্থ থাকছে না,—শশাঙ্ককে সকলেই ছেড়ে দিয়েছে যেন, ললিতাও,—এই জেনে না-জেনে শশাঙ্কও ললিতাকে ছেড়ে দিয়েছে।

শীতের গভীর রাতে সকলেই সকলকে ছেড়ে দেয় যেন—নিজেকেও কেউ ধ'রে রাখতে পারে না।

কিন্তু তবুও শশাঙ্কের শীত ও গভীর রাত—সকলের চেয়েই আলাদা।

কিন্তু তবুও এমনতর রাতেও বুকের কাছে কেউ এক জন আসছে : তাকে নিয়ে ভালোবাসা বা লালসার কথা কিছু নেই, তাকে রক্ষা করবার, তাকে সান্ত্বনা দেবার, তার ভালো—মঙ্গল করবার একটা ইচ্ছা আছে শুধু।

ললিতার কথা মনে হ'লে কখনই বোধ হয় না তাকে ভালোবাসতে হয় বা সে ক্ষুধার জিনিস কিছু; এমন গভীর শীতের রাতে পৃথিবীর সমস্ত পাপ হিংসা বা ব্যথার হাত থেকে তাকে বাঁচাতে ইচ্ছা করে শুধু, নিজের সমস্ত ইচ্ছাগুলো—একটা মস্ত বড়ো চিলের ডানার মতো বেড়ে উঠে ছোট সাদা ডিমের মতো আত্মাটাকে ললিতার একটা জায়গা দিতে চায়, একটা আশ্বাস, ঘুঘুর...

সমস্ত শীতের রাত ভ'রে এই রকম ক'রে সে বেঁচে থাকছে। দেশের বাড়িতে হেমন্তের রাতে ললিতার পাশাপাশি শুয়ে মৃত্যুর বা মৃত্যুর মতো নিঃসাড়তার অ-জ্ঞানের ভিতর নেমে পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ললিতাকে সে এক বার ডাকত : অম্নি সাড়া পাওয়া যেত; একটি ছোট মেয়ের মতো মা'র হাতে মার খেয়ে-খেয়ে যে সারা দিন কেঁদে বেড়িয়েছে, কিন্তু তবুও রাতের সময় মা ছাড়া যার আর কেউ নেই, যাকে ছাড়া মা'রও আর কেউ নেই, মা'র আদরের ডাকের উত্তরে যার নরম মাথানাড়াটুকু—এক বার দুই বার—অনেক বার—প্রতিটি বারই—পৃথিবীতে অনির্বচনীয়। এই রকম নরম মাথা নেড়ে উত্তর দিত ললিতা; শিশুর মতো আশ্বাসে উত্তর দিত—একটা শব্দে কিম্বা তার আধখানাতেই।

শশাঙ্ক নিশ্চয়ই জানে যে মেয়েমানুষ মাত্রই এ-রকম নয়।

ভালোবাসা কেউই আজ আর জানাতে পারে না বটে, কিন্তু ক্ষুধা জাগায় খুব—তা মিথ্যে নয়।

কিন্তু ললিতা এই দু'টো জিনিসেরই বাইরে।

যদি সে কুৎসিত হত তা হ'লে এই জিনিসটাই তো সব-চেয়ে বেশি স্বাভাবিক হত। কিন্তু ললিতার কাছে বসলে শশাঙ্কের নিজেকেই কুৎসিত মনে হয়—অনেক দিক দিয়েই—হাঃ হাঃ। কিন্তু তবুও নিজের বুকের ভিতর এমনই একটা জোর পাওয়া যায়—নিজেকে প্রেমিক স্বামী বা প্রেমিক মানুষের চেয়েও এমনই বেশি শক্তিশালী ব'লে মনে হয়! এ-সব কীসের জোরে?

ক্ষুধার জোর এর কাছে পিঁপড়ের মতো—ভালোবাসার জোরও।

এ কে? এ এক অদ্ভুত রসের ঈশ্বর; এই দয়া। কিন্তু এক জন সুন্দরী পবিত্র স্থির মেয়েমানুষকে দয়া করার কী যে অর্থ মানুষকে কী ক'রে তা বোঝাবে শশাঙ্ক! কিন্তু তবুও নিজেকে প্রতি পদে-পদেই তো বুঝতে হচ্ছে। পৃথিবীতে অনেক দিন বেঁচে থেকে সে একটা কিছু পেয়েছে : পৃথিবীকে সব-চেয়ে বড়ো জিনিস যা সে আজ দিতে পারে, তা এই : দয়া। ললিতাকে দিতে পারে এর চেয়ে বেশি আর কিছু নেই তার—শশাঙ্ক

আর কিছুই দিতে পারে না—যদিও ললিতার দেহ ও মনের মোহ ললিতার সমস্ত জীবনটাকে নিয়ে একটা মস্ত বড়ো গ্রীষ্মের দিন তৈরি ক'রে রাখতে পারত পৃথিবীর অনেক দিককার মৌমাছিদের জন্য।

শীতের রাত—শীতের রাতে শশাঙ্ক এই সব ভাবছে।

এম্নিতর রাতের গভীরে ললিতার কাছে শুয়ে যখনই শশাঙ্ক তাকে বলেছে : 'আমরাই আদরের—' ওম্নি ললিতা তার পাখির ছানার মতো নরম ছোট মাথাটি নেড়েছে, বুঝিয়েছে যে, হ্যাঁ তাই-ই তো; এম্নি যত বার শশাঙ্ক তাকে শুধিয়েছে তত বারই ওম্নি ক'রেই জবাব দিয়েছে ললিতা; যেন প্রতিটি বারই সায় না দিলে চলে না, যেন ললিতাকে ঠাট্টা করার কোনও উদ্দেশ্যই শশাঙ্কর নেই, যেন এক জন সব সময়ই সমস্ত প্রাণ ঢেলে তার জবাব চাইছে, অতএব সমস্ত প্রাণ ঢেলেই তাকে প্রতিটি বারই জবাব দেওয়ার আর এক জনের দরকার।

ছোটদের সরলতা ও বিশ্বাস এই রকম—তার সমস্ত বয়স ও বিচার সত্ত্বেও ললিতা এম্নিতরই ছোট; এবং ললিতাকে এম্নি ক'রে আস্বাদ করা তার দেহ ও মেয়েমানুষপনার আস্বাদের চেয়ে শশাঙ্কের কাছে ঢের সম্পূর্ণ, অনেক গভীর।

এই তার স্ত্রী। কিন্তু ললিতাকে স্ত্রী বল্লে কিছুই বলা হয় না। শশাঙ্ক আরও অনেক রকম স্ত্রী পেতে পারত। পৃথিবীর মেয়েমানুষরা নানা রকম; তাদের অনেক রকমকেই সে চেনে। কেউ তাকে উত্তেজিত করত, উৎসাহিত করত, নিরাশ করত, ভাবতে দিত, জানতে বলত, মীমাংসা চাইত—সব কিছু করত, কিন্তু এমন পাখির ছানার মতো নরম মাথা নেড়ে সমস্ত রাত ভ'রে কে তাকে জবাব দিত?

না, শশাঙ্ক আর তাকে ভয় দেখাবে না।

কিন্তু এখন এই এমনতর রাতে—এই শীতে—তার বিছানায় শুয়ে কী করছে ললিতা?

এম্নি ক'রে কত দিন তার থাকতে হবে।

কিন্তু শশাঙ্ককে সে শিগগির আর কাছে পাচ্ছে না।

ললিতার প্রতিটি রাতের কথাই শশাঙ্কের জানতে ইচ্ছা হয়—প্রতিটি রাতের প্রতিটি মুহূর্তের কথা—খেজুর গাছের রসে মৌমাছিদের ভনভনানি, বেড়ার ফাঁকের থেকে চাঁদের আলো কিম্বা অমাবস্যার অন্ধকার, ভাঁড়ারঘরের ছাদে পেঁচার ডাক, চাঁদে-পাওয়া কুকুরটার সারা রাত খচখচ খেইখেই, রাতের পাখিগুলোর চুনমুন-চুনমুন : কী করছে ললিতা?

বিছানায় উঠে জেগে ব'সে আছে?

লেপের অন্ধকারের ভিতরের থেকে শশাঙ্ককে ডাকছে? রোজই হয়তো সে শশাঙ্ককে ডাকে—রোজ রাতেই—যখনই জেগে ওঠে তখনই।

কয়েক দিন কোনও চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না ললিতার।

রাতের—শীতের—হয়তো জীবনটারই নিরেট শক্তির মুঠোর ভিতরে প'ড়ে

থাকতে-থাকতে মনে হচ্ছে এ যদি দয়া না করে। কয়েক দিন আগে না জানি কোন উৎসাহের শক্তিতে ইঁদুরটাকে যখন শশাঙ্ক মেরে ফেলেছিল, তখন নিজেও সে কি দয়া দেখিয়েছিল। জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ছে যখন উত্তেজনা ও শক্তি শশাঙ্কের দয়াকে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। শীতের রাতের, জীবনের, অগাধ শক্তি ও উত্তেজনা কাউকে যদি দয়া না করে, তা হ'লে নাও করতে পারে; অনেককেই তো করে না।

ছবির পর ছবি মনে প'ড়ে যাচ্ছে যেখানে জীবন মানুষকে দয়া করে নি, শক্তি তাকে ক্ষমা করে নি।

গভীর শীতের রাতে এই শক্তির ওজনকে খুব চুপ ক'রে বুঝতে পারা যায়,—যারা তার কাছে প্রার্থনা ক'রে বল পায় তাদের মতো হতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বল পাওয়া যায় এই ভেবে যে যারা তাকে প্রার্থনা করে বা না করে সকলকেই সে একই ভাবে দেখে, এবং মানুষেরা একেবারে প্রায় সেই শক্তিরই সমান হয়ে ওঠে তাদের সহ্য করবার শক্তিতে—অপেক্ষা করবার ক্ষমতায়।

শশাঙ্ক প্রার্থনা এক সময়ে ছেড়ে দিয়েছে; ছেড়ে দিয়ে ভেবেছে—কিছুই সে ভাবে নি—মনেও হয় নি যে কিছু সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু অনেক দিন পরে আবার—প্রায় ডজনখানেক বছর পরে—এ-জিনিসটার দরকার সে বোধ করছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি অদরকার সে বোধ করছে।

জীবনের ভিতরে এই আঘাত; আগেকার সেই উদাসীন উড়ো জীবন—তা চ'লে গেছে।

শীতের রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ঘুমের পর জেগে থেকে-থেকে আবার ঘুম পেতে-পেতে মনে হয় ঘুমই কি সব-চেয়ে বড়ো—ভালোবাসার চেয়ে লালসার চেয়ে কেউ কী?

সকল মেয়েমানুষরাই ; তারা বেড়ে গেছে; নিজেদের অপমানিত বোধ করে; উত্তেজিত কথায় উত্তর দেয়। তাদের ঘিরে কেমন একটা ঝাল।

কিম্বা নিজেদের অসামান্য পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, বিচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা ক'রে চলে তারা : কিন্তু তবুও তাদের ঘিরে কেমন একটা ঝাঁঝ।

ললিতা তাদের কারুর মতোই নয় যেন—এক জোড়া ছোট ডানার মতো সে। কেউ যেন তাকে একটা ডিমের মতো জন্ম দিয়ে চ'লে গেছে। মাঘের রাতের শেষে—একটা নিস্তব্ধ খড়কুটোর বাসার ভিতর অবশিষ্ট একটা নিরালা ডিমের মতো প'ড়ে রয়েছে সে। যেন যে-কেউ তাকে নষ্ট ক'রে দিতে পারে, কিন্তু তবুও কেউই যেন তাকে নষ্ট ক'রে দিতে পারে না।

হেমন্তের রাতে বিছানায় শুয়ে শশাঙ্ক ললিতাকে গল্প বলত : হয়তো একটা নিতান্তই কঠিন কবিতার ভিতরের প্যাঁচানো জড়ানো জারিজুরির গিঁটের ভিতরের গিঁটের মতো গল্পটা।

কী বুঝত ললিতা?

কিন্তু তবুও গল্প শেষ হয়ে গেলে সে মাথা নেড়ে বলত : না—না—না—আমাকে ছেড়ে যায় না; আমাকে ভয় দেখায় না। হাঃ! সমস্ত রাত ভ'রে শশাঙ্ককে সে আঁকড়ে থাকত—এমনি সমস্ত সব শীতের রাত ভ'রে।

ভোরের বেলায় উত্তেজিত বিড়ালের বাচ্চার মতো শশাঙ্কের চোখের উপর এক থাবা মেরে একটা জিজ্ঞাসু শালিখের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলত : কাল রাতে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে কেন, শশা?

শীতের রাত চলেছে।

যেন ঘুম—ঘুমের ভিতরের অস্বাভাবিক—স্বাভাবিক—নতুন—পুরোনো—উত্তেজিত বা নরম জিনিসগুলোকে সে জীবনের সত্য ব'লে বুঝতে বলে—এই শীতের রাত।

ঘুমোতে-ঘুমোতে চারদিককার অন্ধকার ও আড়ষ্টতার ভিতর জেগে গেলে সে যেন জীবনের ভরসা, সাধ ও আস্বাদগুলোকে পেঁচার ক্ষিধের কাছে মেঠো ইঁদুরের আঘ্রাণের মতো মনে ক'রে খোঁজ করতে আসে। (এই শীতের রাত।)

বড়ো রাস্তার উপর এই কয়লার ঘরখানায় শুয়ে থেকে শশাঙ্ক বুঝতে পারছে না যে শহরের রাতের গভীরতা আরম্ভই-বা হচ্ছে কখন—কখন যাচ্ছে শেষ হয়ে।

দুপুর রাতের আইডিয়া শশাঙ্কের আর এক রকম ছিল। তখন সে তেতলার দক্ষিণের দিকের ঘরগুলোতে থাকত—সবই সে জানে এই ভেবে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ত সে। কিন্তু এখন দেখছে সারাটা রাত সম্বন্ধে এ-রকম ধারণা কোনও দিনও তো সে ক'রে উঠবার সুযোগ পায় নি। দেখছে সে, এমন কোনও সময়ই নেই যখন রাস্তা দিয়ে মানুষের পর মানুষ হেঁটে না যাচ্ছে—তাদের গভীর রাতের জুতোগুলো খচ্চরের ক্ষুরের—যেন এক দল ঘোড়া বা খচ্চর যাচ্ছে। তারা সকলেই চলতে-চলতে কথা ব'লে যাচ্ছে—কী বলছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না—কিন্তু নিজেদের কথায় আচার্য বা প্রফেসরদের চেয়েও তাদের বেশি বিশ্বাস আছে—কাজেই গলার আওয়াজও ওদের চেয়ে আরও চড়া। উৎসাহ আছে এদের—সারা রাত ধ'রে রাস্তা যদি না ফুরুত, উৎসব করতে-করতে হেঁটে যেতে পারত তবুও এরা।

গভীরতম রাতেও লরির শব্দ দক্ষিণ দিকে ম'রে যেতে-না-যেতেই উত্তরে আবার জন্মায়—যেন ভূতের হাত আছে কোথাও; লরি, মোটর, ওয়েলার, স্যাণ্ডো ও ব্রুহ্যামে যেন আঠারো শো আশি সালের আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই রাতের গভীরতমের ভিতর।

সারা রাত ধ'রে রাস্তায় এই সব শব্দের ভূত।

সারা রাত ধ'রে বুড়ো ইঁদুরগুলো এক কোনায় ঘাপ্‌টি মেরে কাঁপছে হয়তো—হয়তো কাঁদছে—চোখ দিয়ে লোল গড়াচ্ছে তাদের ক্ষিধের—বুড়ো বয়সের ও শীতের এই গভীর দুঃখের।

বুড়ো হ'লে গরিব হ'লে এই রকমই হয়,—আচার্যেরাও তা জানে; যদিও যে-আচার্যেরা কলেজের (ও প্রিন্সিপাল), তারা তা নাও জানতে পারে।

জোয়ান ইঁদুর দু'-চারটা ক্ষিধের লালসার কামড়ে শীতকেও অগ্রাহ্য ক'রে ফিরছে—ঘরের ভিতর তাদেরই আক্ষেপের গোলমাল।

কিন্তু এখানে একটা শূন্য শুকনো চায়ের পেয়ালা, মুড়ির টিনও নেই—বা, এক টুকরো রুটি,—কিন্তু জীবনের লালসা? তার জন্য তাদের সব জায়গায়ই সব সময়ই অবসর রয়েছে।

সমস্ত সকাল বেলাটা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খবরের-কাগজ পড়বে শশাঙ্ক। আজ সে নিজেই পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে নেবে। কোনও রকম চাকরিবাকরি সুবিধা কমিশন বা কিছুরই খোঁজ করতে কোথাও সে যাবে না আজ আর,—সে-সবের ঢের দেখেছে সে।

আজকের দিনটা তাকে একটু মিঠে অবসর নিতে দেওয়া হোক; কোথাও কোনও কাজ নেই তার বটে; কিন্তু তবুও এই শতাব্দীরই এমন নিয়ম যে বেকারও অবসরের আমোদ পেতে পারে না—যদিও তার সমস্ত সপ্তাহগুলো—সপ্তাহের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তই পৃথিবীতে তারই জন্য অপেক্ষা করছে শুধু। কিন্তু তবুও এ যে কত বড়ো ঐশ্বর্য তা তাকে বুঝতেই দেওয়া হয় না—জীবনের কোন এক ফাঁকে এক করিৎকর্মা কর্মকর্তা লুকিয়ে থেকে তার প্রতিটি মুহূর্তকেই অত্যন্ত নিখুঁত নিরেট রকমে সাব্যস্ত করতে থাকে—পৃথিবীর কোনও ব্যবস্থা বৈঠক আয় বা উপায়ের খাতার থেকে মানুষটির নামটাই হয়তো সে বরাবরকার জন্য খারিজ ক'রে দেবে।

কিন্তু এই সব কর্মকর্তাদের—বস্—প্রিন্সিপাল—সিনিয়র অফিসর—সেক্রেটারিদের ভূতের ভূতকে শশাঙ্ক আজ ভুড্ডু দিয়ে দিক। বুঝুক সে—যে, এক দিনে লাখ টাকা পেয়েও মানুষ লাখ-দিনে-যে-এক-টাকা-পায় তার চেয়ে বেশি আনন্দ নাও পেতে পারে।

এই জন্য অবাধ নিশ্চিন্ত অবসরের দরকার—হোক না তা একটা সপ্তাহের জন্য—একটা দিনের জন্যই শুধু।

কোনও ক্লাইভ স্ট্রিটের ভাগ্যে কি এই আনন্দটুকু আছে? কোনও বার্কমায়ারের জীবনে?

যখন তারা পাহাড়ের ঠাণ্ডায় গিয়ে অবসর নেয়—তখনও কাজ এবং কাজের চাড়ের জার্ম-প্লাজম বা ঠিক ধরতে গেলে এক্টোপ্লাজম তাদের গুঁতোতে থাকে—পৃথিবীর কাজের লোকদের; কথার লোক—এমন-কি বলদের মতো বোবা এবং জোনাকির মতো বধির লেখক-মানুষ ও কবি-মানুষদেরও কি শান্তি আছে? নতুন চিন্তা—কল্পনার নতুন অঙ্কুর এদের কামড়ায়—এক-একটা আইডিয়া এমনই নিঃসঙ্কোচ (অসামান্য অনিন্দ্য) যে ক্যানসারের পোকার মতো এদের মাংসকে নিয়েই যেন তা নেমে পড়তে চায়—সেটাকে ঝেড়ে না ফেল্লে তো চলে না। অসংখ্য নতুন কবিতা, কথিকা, বাণী এবং ছোটগল্প লেখা চাই—এ-পোকাগুলো না হ'লে দমে না। একটা নতুন উপন্যাস আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক—একসঙ্গে এক ঝাড় পোকা ম'রে যাবে। পৃথিবীকে আজ ভোরের বেলা আবার একটা বাণী দেওয়া যাক—নইলে শরীরের সমস্ত মাংসই যেন ছিঁড়ে পড়ছে। কিন্তু তবুও এই বাণীই যদি শেষ বাণী হত!

এ-সব কৃমি সহজে মরে না, অবসরের ভিতর আরও কিলবিল ক'রে ওঠে যেন। সব জায়গায়ই এই কৃমি—

এই সব লোকেরা যারা সাবানের মতো ঘষতেই কথা কাজ আইডিয়া ও লেখার অজস্র ফেনার গাঁদে পৃথিবীটাকে ক্রমাগত উপচে দিচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই নাম ডাক ভালোবাসা মোটর-গাড়ি মনুষত্ব খবরের-কাগজ ন্যায়বিচার ফার্স্ট-ক্লাস-বার্থ আত্মনির্ভর বড়ো-হাজরি ও ভগবানের অশেষ মঙ্গলে বিশ্বাস থাকলেও প্রথম জিনিসগুলো তাদের জীবনে হাড়ের কাজ করছে, এবং দ্বিতীয়গুলো সেই হাড়ে চুন জোগাচ্ছে শুধু।

কিন্তু বরফের বাতাসে, সিমলা শিলঙের দেবদারুতে, রোদে মৌমাছিতে—এমন-কি এক জন মেয়েমানুষ—কুকুর—বা, পান-দোক্তা-চুরুট নিয়ে ব'সেও এরা অবসর পায় না—অবসরের আনন্দে।

এই সমস্ত দিনটা ভ'রে শশাঙ্ক অবসর নেবে।

একটা আইডিয়াকেও সে মাথার জরায়ুর ভিতর বেঁধে নিয়ে খামখা কষ্ট পেতে যাবে না আর—কিছুই লিখবে না—সব-চেয়ে ভালো চায়ের-দোকানে গিয়ে এক টি-পট স্পেশ্যাল চা নিয়ে বসবে—সব-চেয়ে ভালো কেকগুলো—ডিম—টোস্ট—জ্যাম—দামি-দামি চুরুট সব।

সমস্ত সকালটা শশাঙ্ক এই রকম ক'রে কাটাচ্ছে।

এক জন লাটসাহেবও কি এমন কাটাতে পারে? সমস্ত সময়ই একটা রুটিনের কথা মনে হয় না তার?

কিন্তু শশাঙ্কের কোনও রুটিন নেই।

আজকের দিনের সমস্ত খবরের-কাগজগুলো কিনে ফেলেছে সে—ইংরেজি বাংলা—সব রকম মতামত-মতলবের ইতর-উতোর সমস্ত কাগজগুলো।

বিছানাটাকে সাফ—মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে সমস্ত দুপুর ভ'রে কাগজ প'ড়ে সে যাচ্ছে শুধু—চুরুট টেনে যাচ্ছে।

মানুষের মাথাগুলো যে-সব কলামের ভিতর একটু র'য়ে-স'য়ে এসেছে, যেগুলোকে আস্তে-আস্তে চিবিয়ে খেতে ভালো লাগছে কিংবা যেখানে তা কর্কশ—তিতো—কঠিন, তা মার্মালেড বা দিল্লির লাড্ডুর মতো লাগছে; খাচ্ছে শশাঙ্ক—সবই সে আস্বাদ করছে আজ।

হৃদয় যেখানে ভাব্‌সা ভোঁটকা হয়ে উঠছে তা পচা ছানার মতো লাগছে: আমাদের দেশের কাগজগুলোর অনেক জায়গায়ই অমৃতের বদলে এই সব যদিও, কিন্তু তা অমৃত এক-আধ ফোঁটা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না ব'লেই শুধু।

যেখানে শুধুই গালাগাল তা ঘোড়ামুগের মতো লাগছে—নিতান্তই নোংরা মেসের ওঁচা ঠাকুরের রান্না।

কিন্তু এর চেয়েও বোঁদা জিনিস ঢের রয়েছে—বস্তির জিনিস ঢের।

কিন্তু সবই চেখে দেখছে শশাঙ্ক।

কোথাও কোনও প্রতিবাদের কথা নেই, অসহিষ্ণুতা নেই, মনের ভিতর তার— মাথাটা পেট নয়—হৃদয়টাও না।

সমস্ত দিনের সকল রকম বোঝাইয়ে মনটা টিপিটিপি করছে না, মাথাটা ফেঁপে ওঠে নি।

চুরুটের আগুনে গায়ের চামড়া অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে শুধু; চুরুটের ছাইয়ে জামা বিছানাগুলো নোংরা হয়ে গেছে মাত্র।

পরের দিনটা আর এক রকম।

শীতের রাতের বাতাসের ঝাপটায় দরজা দু'টো সারা রাত এক পাল শকুনের মতো ঝটকে উঠেছে—চমকে উঠেছে—চমকে উঠেছে শশাঙ্ক—বার-বার ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু এ-সব দরজা আজকাল আর ছিটকিনিতে ভড়কাবার নয়। বাড়িটা যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল তখনকার কথা আলাদা।

শকুন ডিঙি মারছে; মারুক।

এক-একটা শীতের রাতের সব-চেয়ে আসল কথা হচ্ছে ঘুম। এই ঘুমকে কেউই নষ্ট করতে পারে না—সব-চেয়ে দুঃস্বপ্নও না। অনেক দিন পরে ঘুমিয়েছে শশাঙ্ক— লেপের শালুর ভিতর থেকে যে-দিক দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে প্রথম রাতেই অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সে-দিকটা পা দিয়ে চেপে ধ'রে দাঁতগুলো খিটিমিটি ক'রে কোন্ একটা শয়তানকে সে মেরে ফেলেছে ভেবে মহা-আয়েসের সঙ্গে ঘুমিয়েছে সে। জেগে-জেগে ঘুমিয়েছে—ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে জেগেছে, কিন্তু প্রতিটি সময়ই বুঝেছে যে অবসন্ন মাংস তৃপ্তি পাচ্ছে।

কলকাতায় এসে শীগগির সে এমন বোঝে নি।

কিন্তু শেষ-রাতের দিকে কাগজগুলো ঘরের ভিতর উড়ছে। লেপটা মরা বিড়ালের মতো ঠাণ্ডা—মনটাও।

কী যেন নেই—কারা যেন সব চ'লে গিয়েছে, কাদের যেন সে কোনও দিনও আর পাবে না।

কোথায় তারা?

চার দিক এমনই চুপচাপ; জীবনে যা হবার সবই যেন হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে যেন শেষ বার সকলে তারা মিলেছিল; তাদের সকলের কাজ হয়ে গিয়েছে; কোথাও তো তারা নেই।

শশাঙ্ক তাহ'লে কীসের জন্য অপেক্ষা করছে?

সমস্ত চেনা মানুষ—কথা—কাজ—ইচ্ছা—সাধ—আশা—নিরাশা এরা সকলেই যেন সব-চেয়ে নিকটতম কয়েকটি আত্মীয়ের মতো সব-চেয়ে নিকটতম—কাল সারা রাত ভ'রে শশাঙ্ককে যা দেবার সমস্তই দিয়ে গেছে;—কোন্ একটা মস্ত বড়ো হলঘরের ভিতর অনেক রাত ধ'রে তাদের সঙ্গে যেন শশাঙ্ক চা খেয়েছে, গল্প করেছে, কাউকে

মা ব'লে ডেকেছে, কাউকে ভাইয়ের মতো মনে করেছে, এত দিন পরে এদের সকলকে কাছে পেয়ে জীবনে এমন একটা সফলতা এল মনে করেছে শশাঙ্ক,—যাতে সে ভগবানেও বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে, মা'কে অনেক দিন পরে এই বিশ্বাসের কথা শুনিয়ে খুব খুশি করতে পেরেছে সে, সকলে একসঙ্গে মিলে মনের তৃপ্তিতে প্রার্থনা করেছে তারা, তার মা বাবা ভাইদের কাছে পৃথিবীর নানা রকম বেকুবি, আজগুবি, প্রপ্যাগান্ডা, বিষ, অসারতা, অন্যায় ও মিথ্যাকে সারা রাত ভ'রে প্রাণ খুলে ঠাট্টা করেছে সে (যা আর কোনও দিনও কোথাও সে করতে পারে নি)। সকলেই তারা শশাঙ্কের প্রতিটি কথারই মর্যাদা এমন তৃপ্তির সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে যে শশাঙ্কের মনে হয়েছে যে পৃথিবীতে আর কিছুই যেন সে চায় না, বড়ো হলঘরটার ভিতরে একটা টেবিলের পাশে এইখানেই ব'সে সে প্রার্থনা করুক, বিশ্বাস করুক, ভালোবাসুক। এদের সঙ্গে থাকলে তা সবই করতে পারা যায় যেন। এদের ছেড়ে গেলে সে-সবকে তামাশা না ক'রে পারা যায় না। শশাঙ্ক ভেবেছে এই সব—আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চেয়েছে তাদের কাছে। কিন্তু রাতের গভীরে জিনিস গুছিয়ে নিয়ে হঠাৎ যেন কোথায় তারা কোন্ স্টেশনের দিকে চ'লে গেল।

শশাঙ্কই কি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে?

কোথায় তারা গিয়েছে?

তাদের এক জনকেও কি আর পাওয়া যাবে না?

এর পর জীবনের আর কী মানে থাকে।

শেষরাতের শীত ও অন্ধকারের ভিতর কাগজগুলো উড়ছে শুধু।

ইঁদুরগুলো আসা-যাওয়া করছে। সমস্ত কলকাতার শহরটাকে একটা পাড়াগাঁর মতো মনে হচ্ছে—তার সমস্ত কাজই যেন ফুরিয়ে গেছে।

কলকাতার মানুষগুলো সব গভীর রাতে উঠে কাদের যেন পোড়াতে গিয়েছে—তারপর কেউ আর ফেরে নি।

শশাঙ্ককে তারা অপেক্ষা করবার জন্য রেখে গেছে।

রাস্তাটা অনেক ক্ষণ ধ'রে নিস্তব্ধ হয়ে প'ড়ে রয়েছে।

কলকাতা শহরটাকে জীবনের সব ক'টি বছর ব'সে শশাঙ্ক যেমন ক'রে বুঝেছে—এ যেন সেই শহর মোটেই নয়।

এর গোলমাল—ধোঁয়া—ধড়াক্কা—পুঁজ—রক্ত—উদ্গার—ভালোবাসা—লালসা—ক্ষুধা—পীড়া—চিৎকার—রাগ—রগড়—কাজ—কথা—কলম কোথাও যেন কিছু নেই।

এই সমস্ত মিলে এর ভিতর যে একটা তড়পানি তৈরি ক'রে রেখেছিল—যাকে কখনও ঘায়ের টাটানির মতো—কখনও-বা জীবনের উৎসাহের মতো মনে হত তা যেন ফুরিয়ে গেছে।

অনেক সময় শশাঙ্কের জীবনের সমস্ত ব্যথা ও বিরক্তিকে একটা ভোঁতা ছুঁচের

মতো ধুলোর ভিতর থেকে (আর কেউ যখন খুঁজে বের করতে পারল না) কলকাতা চুম্বকের মতো টেনে নিয়েছে—বাঁচতে বলেছে—বিঁধতে বলেছে—কাঁটা দিয়ে উঠতে বলেছে—কাজ করতে বলেছে—চারদিককার চুম্বক ও বিদ্যুতের সাগরের ভিতর শশাঙ্ককে নিয়ে ভাসিয়ে-ভাসিয়ে বেড়িয়েছে।

সেই কলকাতা কোথায়?

ছাদের উপর পায়চারি করছে শশাঙ্ক।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে হয়তো; সমস্ত রাস্তা জলে কাদা হয়ে গেছে; কোথাও-কোথাও ছোটখাটো জলের খাঁজের উপর গ্যাসের আলো? অন্ধকারের ভিতর দূরে একটা পুকুরের দিকে তাকিয়ে মনটাকে কিছুতেই আর শক্ত ক'রে রাখতে পারা যায় না।

কিন্তু তবুও চার দিকে সব জল শুকিয়ে যাচ্ছে; আকাশ পরিষ্কার; নক্ষত্রদের অদ্ভুত ইশারা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ধরা—ছোঁয়া—বোঝা যায় এই সব জিনিস আসছে এখন : অবাধ শব্দ, অনেক মানুষ, অতিরিক্ত রোদ, অনেক রকম কাজ।

শশাঙ্ক রগড় করবার জন্য নীচে নেমে যাচ্ছে।

শেষরাতের বিছানার থেকে ছাদে—ছাদের থেকে ভোরের বেলার রাস্তায়—রাস্তার থেকে রাস্তায়—মানুষগুলোর থেকে মানুষগুলোর ভিতর—রোদের থেকে রোদে—আকাশের দিকে তাকাতে-তাকাতে আকাশের থেকে আকাশেই যেন : এই সবের ভিতর একটা নিস্তার পাওয়া যায় যেন, নিজেকে বুঝতে পারা যায়—নিজের অবিশ্বাসকে ও কঠিনতাকে—

কিন্তু কালকের রাত একটা রাত গিয়েছে!

জীবনে একটা ছবি পেয়েছে সে।

সেই সব পুরোনো দিনে তার মা বাবা বোন ভাইদের ভিতরে যখন সে থেকেছে তখন সে তৃপ্তি পেত—বাবার প্রার্থনা তার ভালো লাগত—মনে হত পৃথিবী কোনও একটা মঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে—মনে হত বাবা যা বলছে বাস্তবিকই তাই : সকলের চারদিক ঘিরে একটা শান্তি ও আনন্দ রয়েছে।

এই সব সে এখন আর ভাবতে পারে না বটে।

কিন্তু তবুও যখন তা পারত, তখনকার কথা ভেবে জীবনের সেই শীতের রাতগুলোকে, মানুষগুলোকে, তাদের আশা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্বাভাবিকতা ও উৎসাহগুলোকে সে অন্য এক নক্ষত্রের জিনিস ব'লে মনে করে।

এই লেখাটি জীবনানন্দ প্রেসকপির মতো ক'রে তৈরি করেছিলেন। পরে, যে-কোনও কারণেই হোক, তিনি লেখাটি সম্পর্কে আগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, এবং পাণ্ডুলিপির প্রতি পাতার পিছনের পৃষ্ঠাটি তাঁর শিশুপুত্রের বিদ্যাচর্চার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে; অবশ্য সেই প্রয়াসের অভিব্যক্তি লিখিত পৃষ্ঠাগুলির উপরে গিয়ে

পড়ে নি, এবং খাতাটি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন তিনি। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণে মনে হয়, গল্পটি খ্রি. ১৯৩৪-এ লেখা, এবং তাঁর বরিশাল-বাসকালে লেখা।

গল্পের শিরোনামটি জীবনানন্দ-নির্দেশিত নয়, গল্পের একটি পংক্তির একটি অংশ বেছে নিয়ে নামটি দেওয়া হয়েছে।

2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Bank [illegible] Post office [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সমরেশ

প্রায় কুড়ি বছর পরে সমরেশের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে নিয়ে একটা নিরিবিলি কোণ বেছে বার করল। আমরা বসলাম দু'জনে।

সমরেশ বল্লে : মাঝে-মাঝে খেতাম। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই। তুমি জান না, আমি মদ ধরেছিলাম। খুব বেশি খেতাম না অবিশ্যি কখনও ; কিন্তু নেহাৎ কমও খাওয়া পড়ত না। বাইরে গিয়ে মদ খেতাম না আমি। কচিৎ খেতাম হয়তো এক-আধ দিন। আমার মদ খাওয়া চলত আমার নিজের বাড়িতেই—গোপনে। প্রকাশ্যে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলে—কিংবা হোটেলে-কাফেতে দল ভারি ক'রে মদ খাওয়া আমার পোষাত না। কেন জান? আমি মানুষটা হচ্ছি সাত্ত্বিক—

শুনে আমার হাসি পেল। ব্যাঙ্ক চলন্ত ট্রেন পোস্ট-অফিস-এর ভ্যান এক দিন লুঠ করেছিল যারা স্বদেশীর উন্মাদনায় তাদের সর্দার ছিল তো সমরেশ।

—হাসছ, নিখিল, কিন্তু জেনে রেখো আমি মানুষের মতামতকে বড্ড সমীহ করি—সমরেশ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে : কেউ যদি বলে ইন্দ্রনাথবাবুর ছেলের একটু মাল টানবার অভ্যাস আছে—

—ইন্দ্রনাথবাবুর ছেলের?

—হ্যাঁ, পৈতৃক সুনামে মাছি পড়বে সে আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

—এবং সাত্ত্বিক মানুষ তুমি; হাসালে, সমরেশ।

সেই বিপ্লবী উদ্রিক্ত খুনে ডাকাতের এ কী পরিবর্তন! চা-ও খেত না, আজ চুরুট টানছে, মদ খাওয়া নিয়ে খিস্তি করছে। সাত্ত্বিক হয়েছে বলছে।

—তুমি হাসছ, কিন্তু সত্যিই আমি সাত্ত্বিক রুচির মানুষ; সহজে আমার রক্ত তাতে না। উত্তেজিত পিপাসিত হয়ে উঠি ব'লে আমি মদ খাই না। আমি খুব ঠাণ্ডা মনেই মদ খাই।

—তা-ই বুঝি? খেতে কেমন লাগে?

—খারাপ নয়।

—আজ একটু হবে?

—না। আমি ছেড়ে দিয়েছি। যখন খেতাম, তখনও অন্য কাউকে বখাতাম না।

—আজ বিশ বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। পেটে একটু না পড়লে চলে?

কথাটা সমরেশের কানেই পৌঁছাল না যেন; চুরুটে এক টান দিয়ে সে বল্লে : কোনও দিন মাতলামো করি নি। অথচ অনেক মদ খেয়েছি। কিন্তু কোনও দিন খাব না আর। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এ কী, তুমি কাঁটা-চামচ সরিয়ে রাখলে যে!

—কী আর খাব

—একটা রোস্ট খাও—ফাউল রোস্ট—

—না, না, আমার দাঁত টনটন করছে।

—তা হ'লে কফি খাও—

—এরা কফি কেমন করে?

—বেশ ভালোই। দু'-তিন কাপ গরম কফি চলুক।

আমি যে মদ খেতাম, এ-কথা কেউই জানে না—আমার স্ত্রী অব্দি না। অথচ দিশি বিলিতি এমন কোনও মালই নেই যা আমি পাচার করি নি।

সমরেশ কফি ঘাঁটছিল।

—তোমার স্ত্রীকে ফাঁকি দিলে কী ক'রে? তাঁর তো জানা উচিত?

—জানে নি তো।

সমরেশ বল্লে—মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু যত দিন খেয়েছি আমি ইন্দ্রনাথবাবুর নাতি ও চন্দ্রনাথবাবুর ছেলে হয়ে এ-কাজ করছি—এই ভেবেই মনে দুঃখ পেয়েছি; আমার চরিত্রের যে-শুদ্ধতা, কোনও মেয়েমানুষই কোনও দিন তা কড়কে দিতে পারে নি; সেইখানে মদ এসে কড়কাল এই ভেবে মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করেছি। কিন্তু—

টেবিলে কফির পট দুধ চিনি এসে হাজির হল।

আমার পেয়ালায় কফি ঢালতে-ঢালতে সমরেশ বল্লে : তুমি বোস—আমি আসছি—

ব'লে আচমকা সে উঠে গিয়ে কোথায় দরজার পরদার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনিট পঁচিশেক পরে ফিরে এসে : মদ এক অপূর্ব জিনিষ।

—তা বটে। কিন্তু খেতে কেন তুমি? এখনও তো খেয়ে এলে। মানুষের জীবন তো মদের চেয়েও অপূর্ব।

সমরেশ মাথা নেড়ে স্বীকার করল ; বল্লে—সে-জীবন থেকে পালিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ ক'রে মদ ধরি নি আমি। আমি আমার ছেলেকে ভালোবাসি, স্ত্রীকে ভালোবাসি; চাকরি করছি, চাকরির উন্নতি হচ্ছে;আরও উন্নতির জন্যে প্রাণপাত করবার মতো শক্তি আছে রুচি আছে আমার। আমি অসামাজিক নই। মানুষের দলে ভিড়তে—ভালোবাসতে আমার ভালো লাগে। সমাজকল্যাণ চাই আমি। এ-সব জেনেশুনেও স্থির চোখে মদ খেতে শুরু করলাম—

আমি আবার কফির অর্ডার দিয়েছিলুম। বয় সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে দিয়ে গেল।

আমার কফির পেয়ালায় দুধ চিনি মিশিয়ে আমার কাঁধের উপর তার ডান হাতের থাবা বিন্যস্ত ক'রে রাখল সমরেশ, নীরব নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

—তুমি কফি খাবে না, সমরেশ?

—না

—কেন? দু' পেয়ালা কী হবে?

—তুমি আস্তে-আস্তে খাও। তারিয়ে-তারিয়ে খাও। অপূর্ব—অপূর্ব—অপূর্ব—বলতে লাগল সমরেশ।

—কাকে তুমি অপূর্ব বলছ

—অপূর্ব? আমি? অপূর্ব এই পৃথিবী। অবিস্মরণীয় এই হোটেল—এই বিলিতি হোটেল—এই ক্লাইভ স্ট্রিটের সাহেবদের দম তো সব মদ্যময়, নি-খি-লে-শ!

—নি—খি—লে—শ!—

সবুর, আমাকে কফি খেতে দেবে না! আহা, করছ কী, সমরেশ—দিলে তো কফি ঢেলে, গেল ছিটকে সব—এখন পেয়ালাটাকেও না ভেঙে ছাড়বে না দেখছি—

—আমাকে অচ্ছুত করবে তুমি! সে হাত সরিয়ে সটান হয়ে বসল। —কারু সঙ্গে আমার মনকষাকষি নেই তো। সবই উজ্জ্বল। উজ্জ্বল—নিরুজ্জ্বল—পবিত্র। দেখেছ কী অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে! কী জাজ্বল্যমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! তুমি কফি খাচ্ছ, পাগল, নিখিলেশ, নি-খি-লে-শ—, অথচ এই দুর্দান্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে দেখছ না—টার্নার মনিয়ন, বুলরু লাভিসে, শ'ওয়ালেস, জারডিন স্কিনার, হোরেস মিলার বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরছে সব। ওই সিলিঙের দিকে তাকিয়ে দেখ! তাকিয়ে দেখ দেয়ালগিরির দিকে। কী অভাবনীয়—অনির্বচনীয় সব ফ্রেস্কো—দেখছ নিখিলেশ—

—দেখছি বৈ-কি—

—কী বিরাট কারুকার্য এই একটা বিধাতার। চারদিকে দুর্দান্ত মোজেয়িক জ্বলজ্বল ক'রে উঠছে যেন আমেরিকার এক-একটা স্কাইস্কেপার-এ আগুন ধামসাচ্ছে—নি-খি-লে-শ—

—আচ্ছা!

—কফি খাচ্ছ? আগুন লেগেছে, না?

—কোথায়?

—বাঃ, এই হোটেলে—কলকাতা—প্রশান্ত মহাসাগর—আটলান্টিক—আঃ, কী অন্তহীন অন্তহীন আগুনের মোজেয়িকের ভিতর ব'সে আছি তুমি আর আমি। আঃ, কী আগুন, কী আরাম। ওই যে দূর আকাশের তারাটি তড়পাচ্ছে—দেখছ তো—

হোটেলের গহ্বরের এক কোণের ঘেরাটোপের ভিতরে ব'সে তারা দেখবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছিল না; বল্লাম—ওই তারাটি? ওই যে তোমার আঙুল-বরাবর গ্যাসের ঢাউস বাতিটা? হ্যাঁ, ওকে আমি খুব সুনজরে দেখি। আমাদের পৃথিবীতে তারা—আমরা কি ছায়াপথের ভিতরে?

—ছুই তারাটির নামই অনুরাধা। ও আমার স্ত্রী নয়—ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠল সমরেশ।

হোটেলে তখন বেশি কেউ ছিল না। কিন্তু যে দু'-চার জন লোক খাচ্ছিল কিংবা পেগ টানছিল, তারা সমরেশের দিকে এক বার ফিরে তাকাল কী না তাকাল, মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের কাজে মন দিল তারা।

—বান মাছ দেখেছ

—দেখেছি বৈ-কি

—দিঘির শ্যাওলার ভিতর কেমন সটকে বেড়ায় দেখেছ! ওকে বলে বান-সটকান্ সটকানো—হোঃ হোঃ হোঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আমি সটকে পড়েছি, নিখিলেশ—এক পরস্ত্রীর হুদ্দায়।

—কবে থেকে?

—সেই পরস্ত্রীটি কে জান, নিখিলেশ?

—কে?

সমস্ত হোটেলটাকে বিপর্যস্ত ক'রে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে হেসে উঠল সমরেশ।

কিন্তু অল্প ক্ষণের ভিতরেই খুব চুপ মেরে গেল।

বল্লে—আমি বিয়ে করি নি। এই বার করব। আমার নিজের স্ত্রীকেই বিয়ে করব আমি। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না তো।

পকেট থেকে একটা ফোটো বের করে সমরেশ। একটি স্ত্রীলোকের ফোটো—ফোটোর নীচে যা লেখা ছিল, তা প'ড়ে বুঝলাম, মহিলাটি সমরেশের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, এবং অল্প কিছু দিন হ'ল (সন্তান প্রসব করতে গিয়ে) মারা গেছেন।

হালে মদ ধরেছে হয়তো সমরেশ। কিন্তু না ধরলেও পারত। মানুষের যখন তৃতীয় পক্ষ গ্রহণের সময় আসে জীবনে, তখন সে তো চতুর্থ পক্ষের হাত ধ'রে সকালে গঙ্গালাভ করবার জন্যে নিতান্তই প্রস্তুত।

—আমাকে বিশ্বাস কর—আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি—বল্ল সমরেশ। কিন্তু আমি অনেক সময়ই ভেবে অবাক হই যে, আমাদের দেশে এক-একটা মানুষের তিন-চারটে স্ত্রীর প্রয়োজন ঘুচল না কেন।

খানিক ক্ষণ নিস্তেজ হয়ে ব'সে থেকে চুরুট জ্বালাল সমরেশ। চুরুটের আগুনের চুমকির জেল্লায় ভ'রে উঠল ক্রমে-ক্রমে তার চোখ।

এক বোতল হুইস্কির প্রয়োজন হয়ে পড়ল তার। আমাকেও খাওয়াবে।

—চার জন স্ত্রী পর-পর আসে—একসঙ্গে এসে হামলা করে না। সেই জন্যেই ঝুঁকি পোয়াতে পারি—বল্লে সমরেশ।

পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে, বিয়েই করে নি—স্ত্রীলোকের প্রতিও আসক্ত নয়—মদ খেলেও টাকা বেঁচেছে ঢের। তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে খানিকটা সুস্থতা শান্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্যে নানা রকম ভাবে টাকা খরচ করেছে সে; কিন্তু

আমাদের এই আধুনিক পৃথিবীর অগম গোলকধাঁধার অন্ধকারে একটা দেশলাইকাঠির আলোও ঠিকরে বেরুল না তাতে। অনেক কঠিন সমীচীন চিন্তার পর মদ ধরেছে তাই সমরেশ—পৃথিবীটাকে মাঝে-মাঝে অপূর্ব মনে হয় তার, নরনারীর মুখ প্রদীপ্ত মনে হয়, উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রেণুপরমাণুর আলোড়নে মানবসমাজ ঝিকমিক করতে থাকে, অমৃত হয়ে ওঠে।

এর পর এক দিন স্মরেশের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম তার সঙ্গে। অন্ধকার ঘরে একা ব'সে ছিল সে। সমস্ত বাড়িতে একটা চাকর আছে শুধু, আর কেউ নেই।

—তুমি আমাকে সে-দিন একটা ফোটো দেখিয়ে ঠকাতে চাচ্ছিলে কেন, সমরেশ?

—সে-দিনের কথা ছেড়ে দাও, ভাই। যে-সময়টা মদ খাই না, ব'সে-ব'সে এই সব করি আর কী! যুদ্ধ, অগণ্য আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, আরও দাঙ্গা, আরও যুদ্ধ, আরও মন্বন্তর আজকের পৃথিবীতে মানুষ কী করতে পারে আর—ব'লে দেবে আমাকে? এ ছাড়া কোথায় কে কী করছে আর—দেখিয়ে দেবে আমাকে!

যে বিয়ে করে নি, তার তৃতীয় পক্ষের ছবি অপরকে দেখানো ছাড়া আজকের পৃথিবী কি আর কিছুই করছে না? আধুনিক পৃথিবীর ভিতরের কথা কি এমনই অকিঞ্চিৎকর? সমরেশের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে কোনও লাভ হ'ল না। সে আমার যুক্তিতর্ক উপেক্ষা ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

—এখন আমি হুইস্কি খাব। তুমি খাবে?

—না

—অতিরিক্ত মদ খেলে ট্যাঁক ও লিভার পচার হয়? আমি হিসেবি মানুষ, একা মানুষ, আমার ট্যাঁক কিছু আছে; লিভারও ভালো, এটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছি—তিনি কোনও দিন চা-ও খান নি। ভূদেব মুখুয্যের ধাত ছিল বাবার—ব্রাহ্ম-সমাজের ছোঁয়াচেও এসেছিলেন—ও-দিকে ভিক্টোরিয়ার আমল চলছে; মানুষের মনে আশা ছিল ঢের—চা দিয়ে কী হবে? চা!

সমরেশ চুরুট জ্বালিয়ে বল্লে—তিনি এসে পড়েছেন। আচ্ছা, তাহ'লে এখন উঠি।

—তিনি এলেনই শেষ পর্যন্ত। হুইস্কির বোতলটার দিকে তাকিয়ে বল্লাম আমি।

—হ্যাঁ। তোমাকে আর টানব না। তুমি যাও। বাইরের বড়ো-বড়ো সব দিশপাশে আরও কয়েকটা বছর পাক খেয়ে এস। বৈজ্ঞানিক শুভবুদ্ধি, সমাজ, ইতিহাস—এই সবের টনক নিয়ে দেখ কোনও সুরাহা করতে পার কি-না আজকের দুর্দিনের। আমি তোমাকে বলছি, নিখিলেশ পৃথিবীর মঙ্গল হবেই। সাদা চোখে পৃথিবীটাকে খারাপ দেখালেও এই বোতলের জিনিস কিছু টেনে নিলে টের পাই কর্মের পথ ছেড়ে আমি যে আজ সিদ্ধপুরুষ হয়েছি, সে তো ভবিষ্যৎ পৃথিবীর উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখবার জন্য। দেখছি—দেখাচ্ছি, পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছি—তোমরা বুক বেঁধে এগিয়ে চলো। নি-খি-লে-শ!

সমরেশের ঘরে অনেক রাত অব্দি জেগে থেকে দেখলাম, লোকটা মদ খাচ্ছে—মদই খেয়ে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন—বিষয় নিলেমে চড়েছে—প্রিয়জনকে হারিয়েছে, কিংবা ওন্নি কোনও গভীর অরুন্তুদ আঘাত পেয়েছে ব'লে নয় (কিন্তু আঘাত তবুও আরও গভীরতর),—কিন্তু এম্নিই—হো হো ক'রে হেসে উঠবার জন্যে—আমাকে, তার চাকরকে, বেড়ালটাকেও ধ'রে চুমো খাবার জন্যে, সমস্ত আকাশ বাতাস পৃথিবী নক্ষত্রলোকের বিশ্বন্তর সৌন্দর্যে উদ্বেল—উৎসারিত—হয়ে উঠবার জন্যে। ওঃ, সে কী উতরোল হুল্লোড়—সে কী উল্লাস—সে কী উচ্ছলতা!

তারপর কী ভীষণ নিস্তব্ধতা—কী অন্ধকার—কী অনমনীয় অন্তহীন মরণলুপ্তি। দেশ সমাজ জাতি—এবং ক্রমে-ক্রমে সমস্ত গোটা পৃথিবীরই মঙ্গল কী ক'রে হয়, এ নিয়ে দিন রাত মাথা ঘামাতে ও পরিশ্রম করতে দেখেছি সমরেশকে আমি। পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তাদের—বড়ো জমিদারি ছিল—সমস্ত সে নিঃশেষিত ক'রে ফেল্ল একটা অসম্ভব সম্ভাভাবিত স্বপ্নমঙ্গলের উত্তেজনায়। অনেক পড়াশুনা করল, পাস করল; কত রকম দেশকল্যাণ ও সমাজউন্নতির প্রতিষ্ঠান রচনা করল সে, ভাঙল, পুনর্গঠন করল, খাটল, জেলে গেল, বিপ্লব করল, মানুষও খুন করেছিল হয়তো মানবতাকে কনে-দেখা আলো দেখাবার বদলে উদয়সূর্য দেখাবার জন্যে; কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারে নি সে।

কেই-বা দেখিয়েছে? অনুসূর্যের দেশকে উদয়রঞ্জিত অনুসূর্য দেখানো কি সহজ! তবুও মানুষ সাহস স্বপ্ন নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চেষ্টা ক'রে যায়—মহামানুষ যারা। সমরেশ কী রকম মানুষ ছিল? (জানি না।) সম্প্রতি অনেক দিন পর্যন্ত তার কোনও খোঁজখবর পাচ্ছিলাম না। সে চা খেত না, সিগারেট খেত না, বিয়ে যে করবে না তা তো সকলেই জানত, মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাল না কোনও দিন সমরেশ। তার মতো সুদৃঢ় সুপুরুষের পক্ষে এই শেষোক্ত জিনিসটা কেমন অসঙ্গত ঠেকত আমার চোখে। সমরেশকে হাত করবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় পরাস্ত হয়ে এক শরীরী নারী নিঃসহায় ভাবে আমার দিকে তাকালে আমি বিরক্তি বোধ করতাম,—কেন, আমার কথা প্রথম বুঝি মনে ছিল না তোমাদের? আমি কী করব? এই সৃষ্টির অন্তর্লীন বিরাট বেকুবির কাছে তোমাদের মতো আমাকেও ধর্না দিতে হচ্ছে। সমরেশ আমাদের অতীত ; একটি বালিকণার ভিতর সমস্ত সুন্দর সুষম ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পেয়েছে সে—তারপর অন্য দিকে মুখ ফেরাবার নিদারুণ আহ্বান এসে পড়েছে যখন, কেমন উজ্জ্বল নিবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে আছে সে একটি পল-নিপলকণার ভিতর সমস্ত দেশ কাল নিজের বুকের রোমের ভেতরে ঘুমিয়ে-পড়া সারসের ঠোঁটের মতো ঠাঁই পেয়েছে অনুভব ক'রে।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৪৬
শিরোনাম
লেখক-নির্বাচিত

পারিজাত

শুনেছিলাম রজনী যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা করেছে। রজনীকে আমি আয়েসী লোক ব'লেই জানতাম;—যাকে বলে গোঁফে-খেজুরে, তেম্নি ধরনের মানুষ ছিল রজনী। কোনও দিনই তাকে বিশেষ কোনও চাকরি করতে দেখি নি। টাকা রোজগারের ফিকিরে সে থাকত বটে, কিন্তু সে-জন্যে পথে-হাটে মাঠ-বাজারে গলদঘর্ম হয়ে ঘুরে বেড়াতে সে মোটেই রাজি ছিল না। সকালে ঘুমের থেকে উঠে সিগারেটের প্যাকেট বা টিন নিয়ে টেবিলের কিনারে সে অনেক ক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকত; সিগারেট জ্বালিয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে কথা ভাবত; চা খেত অনেকটা সময় নিয়ে—তারিয়ে-তারিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, যেন চা-ও মদ জাতীয় জিনিস কিছু। চেয়ারে ঠেস দিয়ে দু'টো পা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আরাম করতে চেষ্টা করত। কিন্তু ওতে আরাম হয় না; হ'লেও তা অতিক্ষণিকী। কাজেই হাত-পায়ের নানা রকম কসরৎ ক'রে আর নানা রকম ভাঁজে শরীরটাকে মুচড়ে দুমড়ে বেলা দশটা এগারোটা অব্দি দু' দণ্ডের আরাম আয়েসের ব্যর্থ সন্ধানে থাকত সে—দু'-তিন কাপ চা—দু'-তিন প্যাকেট সিগারেট—উড়িয়ে। ইংরেজি এক-আধটা খবরের-কাগজ সব সময়েই কাছে থাকত—ব্যবসায়-সংক্রান্ত সঠিক ও শেষ খবর সব সময়ই জানা দরকার ব'লে।

কখনও শুনতাম রজনী ডালহৌসি-ক্লাইভ স্ট্রিট পাড়ায় ব্যবসায় নয়—চাকরিই করে। বেলী ব্রাদার্সে, বার্ডে, জার্ডিন স্কিনারে—নানা রকম কম্যার্শাল ফার্মেই চাকরি করেছে বটে সে—কিন্তু কোথাও বেশি দিন টেকে নি। চাকরির ফাঁকে-ফাঁকে ব্যবসাও করেছে। ইদানীং ব্যবসাই করছিল। মাঝে-মাঝে দুপুর বেলা তাকে দেখা যেত নোংরা চিনেবাজারের স্যুট প'রে পুরোনো লোহালক্কড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাল আন্দাজ ক'রে নিচ্ছে—উদ্ভুট্টে হ্যাঁচকা হিন্দিতে কথাবার্তা বলছে। শুনে হাসি পেত আমার—মনে হত রজনীটা আহাম্মক ঠিক নয়—তবে কথা বলতে পারে না—চোস্ত কথা ও কাউকে শোনাতে পারে না কোনও দিন : কেমন ঝর্ঝরে হিন্দি ব'লে যাচ্ছে ঐ ইতর শুয়োরকুচি চুলের লোকটা যার সঙ্গে দরদস্তুরি করছে রজনী। কিন্তু তাই কি রজনীর কথা বলতে জিভ জড়িয়ে আসে বটে, কিন্তু ও কাজ হাসিল করতে জানে। ওর

দাঁড়কাকের মতন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলে ক্রমে-ক্রমে একটা আস্ত ঘুঘু বেরিয়ে আসে; —তা-ই তো টের পেয়েছি বরাবর —দেখতে-দেখতে দশ-বারো বছর কেটে গেল। যুদ্ধ এল গেল—রজনী গ্রাউন্ড এনজিনিয়ারিং শিখে ফেল্ল খানিকটা—এরোপ্লেন ও মোটরকারের কলকব্জা নিয়ে বিজ্ঞের মতো নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা অর্জন করল সে। সাহেব-ইনজিনিয়ারদের ভরসা থেকে রজনী-মিস্ত্রির মোলায়েম ও নিপুণ হাতের সাহচর্যের জন্যে টেলিফোন, এমন-কি ট্রাঙ্ককল, এসে হাজির হত মাঝে-মাঝে। তাদের জীপকার—ট্রাক—রজনীর দুয়ারে এসে যখন-তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ত। লাফিয়ে নেমে পড়ত সাদা-সাদা শরীর রজনী বোসের খোঁজে। কিন্তু এ-সব হ'ল রজনীর বাঁ হাতের কেরামত। তার ডান হাত কালোবাজারের অতল অন্ধকারের ভিতর ডুবে-ডুবে জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছিল।

রজনীর বালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার টেরাসে ব'সে ছিলাম। অস্তসূর্যের কমলা রঙের আলোয় তার অপরূপ বারান্দার মোজেয়িক, ফুলের টব, ক্রোটনের কুঞ্জ, ছোট-ছোট পাখিগুলো, দেওয়ালের সমুদ্রফেনার মতো রং, সূর্যসপ্তকের বর্ণশালী সোঁদা জেটির নদীগুলো কেমন একটা বিষণ্ন গম্ভীর অনুভূতির বলয়চক্র রচনা ক'রে চলেছিল আমার মনে। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, আমার এ-অনুভূতির থেকে রজনী কত দূরে—কী হাস্যকর ভাবে ইতর সে, মেকি সে—আজ সময় তাকে দিয়েই গড়িয়ে নিয়েছে আমার নিগূঢ় অনুভূতির সংস্থানলোক।

—রজনী, আশ্চর্য মানুষ তুমি!

সে খানিকটা দূরে আমার মুখোমুখি একটা সোফায় ব'সে চুরুট টানছিল। পরনে তার সেই নোংরা চিনেবাজারের ট্রাউসার্স জামা। আমাকে কথা বলতে শুনে আমার দিকে ফিরে তাকাল এক বার। কী বলেছি আমি সে-দিকে তার মন ছিল না। তবু এম্নিই সে বল্লে : ব্যবসা করা সহজ—কিন্তু ছেড়ে দেওয়া কঠিন। দেখছ তো এখনও আমি এখানে ব'সে আছি; আমার এখন পারটনার সাহেবের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল

—পারটনার সাহেব? কে সে?

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে রজনী বল্লে—না গেলে একটা বড়ো কন্ট্র্যাক্ট হাত-ছাড়া হয়ে যায়—

—কীসের কন্ট্র্যাক্ট?

কীসের যে, তা আমাকে বলা দরকার মনে করল না রজনী। চুরুটে এক টান দিয়ে বল্লে—এতে আমি পাঁচ লাখ টাকা কামিয়ে নিতে পারি, নিখিল; কত লোকে ঘুষ দিয়েও এ-কন্ট্র্যাক্ট পাবে না

রজনী বল্লে—কিন্তু আমার কাছ থেকে ঘুষে বিশেষ সুবিধা হবে না জেনেও পারটনার আমাকে সেধে কন্ট্র্যাক্ট দিতে চাচ্ছে—কিন্তু—

রজনী অন্যমনস্ক ভাবে দূর কমলামেরুন পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল। আমি জানি, প্রকৃতি তাকে স্পর্শ করছে না—বিকেল বেলার রৌদ্র-বিষণ্ন

অন্তহীন প্রসারলোক, আকাশলোক, মন কিছুই নয় তার কাছে; সে-সবের ভিতর প্রবেশ করবার কোনও রুচি নেই—কোনও ক্ষমতা নেই তার। কিন্তু তবুও তাকে খানিকটা নির্লিপ্ত ও বিমর্ষ ব'লে মনে হ'ল—

—রজনী

শুনে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রজনী বল্লে—পারটনার সাহেবের কনট্র্যাক্ট-এর কথা বলছিলাম তোমাকে—

—হ্যাঁ, কী হ'ল—

—ও আমি নেব না—

—কেন?

—নাঃ—

রজনী মুখ বাঁকিয়ে বল্লে—ব্যবসার মুড়ো সাবড়ে এখন আবার ন্যাজ নিয়ে টানাটানি।

—মানে?

টেলিফোন বেজে উঠল। কিন্তু রজনীকে মুহূর্তের মধ্যেই তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠতে দেখব ভেবে নিরাশ হতে হ'ল। সে উঠলই না। টেলিফোন যে বেজে চলেছে তা সে আমলেই আনতে চাইল না।

—শুনছ-না টেলিফোন—

রজনী আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা ভাবছিল, আমার কথার কোনও উত্তর দিল না।

—তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে, রজনী

—ডাকছে, আরও কিছু ক্ষণ ডেকে নিক—তারপরে যাওয়া যাবে—

—কে ও!

—ব্যবসাদার কেউ হবে—কিম্বা—রজনী মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বল্লে—যারা টাকা চিনে মানুষ চেনে তাদেরই হয়তো কেউ এক জন

পুরুষ মেয়েমানুষ ওদের দলে সবাই আছে। রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে—বাঘিনিও বাগড়া দেয় না

শুনে কৌতূহল বোধ করছিলাম। কিন্তু তবুও রজনীকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম না এ-সম্পর্কে কিছু আর।

—টেলিফোন তো এখনও তোমাকে ডাকছে, রজনী—

—ওর মেয়াদ আরও কিছু ক্ষণ আছে। আমি সময় হ'লেই উঠব। উঠে নাকচ ক'রে দেব সব। আমাকে কেন জ্বালাতন করা? আমি ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি—বলতে-বলতে রজনী উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

বল্লে—কে রে? হাড় জ্বালাচ্ছিস কেন? এই ভর-সন্দের সময়।

আমি বল্লাম—বা রে, কাকে কী বলছ, রজনী—পাগল তুমি—কলকাতার মেয়রও তো হতে পারে।

রজনী কান পেতে নিস্তেজ হয়ে ছিল। আমার কথার কোনও জবাব দিল না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, হবে, কখন, কেন, কালকে, অফিস-টাইমে, তিনটের সময়, মগনলাল, আজ? না, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঘোড়েল তো খুব, আচ্ছা—আচ্ছা—বলতে-বলতে মিনিট দু'য়ের মধ্যেই ফিরে এসে রজনী বল্লে—যা বলেছিলাম, তা-ই—ট্রেড উইন্ড

—বাতাসে বাদাম চালিয়ে জোর ছুটছে বুঝি।

—আমি বানচাল ক'রে দিয়েছি।

—কী রকম?

—বলছিল কমলারুলি স্টেট বিক্রি হচ্ছে দু' লাখ টাকায়। আমি আজ যদি কিনে রাখি, তা হ'লে ন' মাস ছ' মাসের মধ্যেই পাঁচ লাখ টাকায় হাতবদল ক'রে দিতে পারব। নিট তিন লাখ টাকা হাতে আসবে।

—এ-খবর কে দিলে তোমাকে?

—আমার এক গিধ্‌ধোড়। সে মিথ্যা কথা বলে নি। জানি আমি সব। কিনবার টাকাও আছে আমার। হেসেখেলে কিনতে পারি। এ-সব ব্যাপারে ঘুঘুও আমি, সাপও, যে-সাপের চোখে ওঝার ধুলো পড়ে না। তিন লাখ টাকা তো গলায় দড়ি ঝুলিয়ে টেনে আনতে পারি। কিন্তু কী, হবে কী—

—কীসে কী হবে

—টাকা কী হবে। আমার টাকার খাঁই নেই।

টেলিফোন বেজে উঠল আবার।

—এ-বার কে ডাকছে

রজনী এ-বার তাড়াতাড়ি উঠে গেল। ফিরে এসে বল্লে—বাজারের খবর দিলে। আমি এক শো বার ওদের ব'লে দিয়েছি আমার সন্ধ্যার মৌতাতটা নষ্ট করবে না। বাজার দিয়ে আমার কী হবে! আমার কি ব্যবসায় মন আছে আর!

গভীর অবসাদে সোফায় এলিয়ে পড়ল সে। বুতোনো চুরুট জ্বালিয়ে নেবার মতো উৎসাহও ছিল না তার। কিন্তু চুরুটে এক-আধটা টান দেবার প্রয়োজন অনুভব ক'রে নেভা জিনিসটাকেই দাঁত দিয়ে কামড়ে নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে রইল।

—বাজারের খবর দিলে? কী রকম খবর?

—ভালো—খুব ভালো। আমি হকের কথা বলছি, নিখিল। তুমি যদি ব্যবসায়ী হতে, তা হ'লে পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা তো খুবই—পাইয়ে দিতে পারতাম তোমাকে—এক হপ্তার ভিতরে।

—দাও-না পাইয়ে, টাকার বড্ড দরকার

—কিন্তু তুমি তো ব্যবসায়ী নও—

—নাই-বা হলাম, মানুষ তো, কাণ্ডজ্ঞান তো আছে। তুমি যদি বাৎলে দাও, একটা দাঁও মারবার সুযোগ যদি থাকে—কেন তুলে আনতে পারব না।

রজনী ঘাড় নেড়ে বল্লে—তুমি তা বুঝবে না।

নিরস্ত হয়ে ভাবছিলাম ডাকপায়রা এক দেশ থেকে আর এক দেশে খবর পৌঁছিয়ে দেয়; কিন্তু খবরের মর্মোদ্ঘাটন করা তার আয়ত্তের বাইরে। ব্যবসার রহস্য ঐ রকমই একটা হবে কিছু। অন্ধকারের ভিতরে রজনীর মাথাটা নিগূঢ় শিবলিঙ্গের মতো উঁচিয়ে ছিল। বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম।

—ফোনে কোন্ বাজারের খবর দিল? কীসের বাজার, রজনী?

—সব কিছুরই। আলপিন—দেশলাই থেকে শুরু ক'রে মেয়েমানুষ অব্দি

রজনী চুরুট জ্বাল্ল।

বল্লে—আমি যদি আমার কার নিয়ে এখন বেরিয়ে পড়ি, দু' ঘণ্টার মধ্যে পনেরো হাজার টাকার মুনাফা নিয়ে ফিরে আসতে পারি।

—কী ক'রে?

—কী ক'রে, তা ব'লে কী হবে।

—দু' ঘণ্টায় পনেরো হাজার টাকা গুছিয়ে আনতে আপত্তি কী তোমার। ইন্দির গাড়ি চালাবে। কোনও হেনস্তা নেই। ক্যাডিলাকের চমৎকার গদিতে ব'সেই—

রজনী বাছুরকে চাঁট মেরে যেন সেয়ানা গোরুর মতো বল্লে—ব্যবসা থেকে বিদায় নেবার সময় হয় নি আমার এখনও। খুব বুঁদ হয়ে ব্যবসা চালালে লাখ-লাখ টাকা কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে এক দিন। আমার তা হতে পারে। কিন্তু তবুও ঘাঁতঘোঁত সব মাটি দিয়ে ভ'রে ফেলছি; খতম ক'রে দিচ্ছি সব।

—কেন?

—আমার টাকার খাঁই নেই।

টেলিফোন মরিয়া হয়ে ডাক দিল রজনীকে আবার। কিন্তু এ-বার রজনী উঠলই না আর।

—ফোন ধরব আমি, রজনী?

—ইচ্ছে হ'লে ধরতে পার। আমি ও-দিকে যাব না—

—এ-বার টাকা নয়—হয়তো কোনও মহিলা তোমাকে ডাকছেন

—ডাকুন

—এটা অভদ্রতা হচ্ছে, রজনী

—আমি টেলিফোন উঠিয়ে দেব।

—তা হ'লে ব্যবসা কী ক'রে চলবে।

—বলছি আমি চালাব না। আমি না চালালেও যদি চলে—তা হ'লে গেড়ে মামদোবাজি ক'রে বেড়াবে আমার চাচার ব্যবসা।

টেলিফোন প্রাণান্তকর আবেদন জানাতে লাগল—রিং রিং রিং রিং রিং—ইরিং—রিং রিং রিং ইরিং রিং রিং রিংরিং রিং রিং। যেন নদীর ভিতরে ডুবে গেছে সে—বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগসেতু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অন্তহীন বুড়বুড়ি কেটে

চলেছে—দু' কানের উতরোল ঝুমকোর ঝঙ্কারে—তলিয়ে যাচ্ছে আরও অথই অন্ধকারের ভিতরে মরিয়া হয়ে উঠে।

—এ কে, রজনী?

—শ্বশুরের বিয়ের ঘরের মেয়ে—শালির বোন!

—বিশেষ বিপন্ন ব'লে মনে হয়

—ওরা না হ'লে বিপন্ন হবে কে আর! বিধাতা তোমাকে আমাকে শালিবাহন ক'রে সৃষ্টি করেছিল ওদের জন্যেই তো।

আপাদমস্তক রজনীর দিকে তাকালাম এক বার।

নাঃ, ডাইনির হ্রীং হ্রীং মন্ত্রের ঝড় পিটিয়ে মানুষকে সোয়াস্তিতে থাকতে দেবে না আর টেলিফোন

—হয়তো ডাক্তারের প্রয়োজন

—আমি তো ডাক্তার নই।

ঠিক কথাই তো।

—টাকার দরকার হয়তো। মরণাপন্ন কেউ—

—টাকা মানুষকে জিইয়ে রাখতে পারে না। যে ম'রে যাচ্ছে, সে-ই তো বেঁচে গেল আজকের এই পৃথিবীতে।

রজনী তাহ'লে আমাকে না উঠিয়ে ছাড়বে না দেখছি। গরজ আমারই বটে; টেলিফোন আমারই কানে হাত দিয়েছে যেন—কান টেনে মাথাটা হিঁচড়ে নিল—

বল্লাম—কে গো

অপর প্রান্তে মেয়েলি গলার ঝঙ্কার পাওয়া গেল। উচ্চকিত হয়ে কী যেন বলতে চাচ্ছিল সে—ব'লেও ফেলেছিল প্রায়—কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল আমি রজনীবাবু কি না।

—রজনীবাবু না। তাহ'লে তাকে ডেকে দিতে হবে এখুনি? আচ্ছা, আমি ডেকে দিচ্ছি—ব'লে ফোনটা নামিয়ে মনের ভুলে রিসিভারের ওপর রেখে দিতেই কানেকশন কেটে গেল।

—ভালোই হয়েছে—রজনী বল্লে

—কিন্তু মেয়েটির অনেক কিছু বলবার ছিল তোমার কাছে—কে মেয়েটি!

—কী ক'রে জানব—অনেকেই তো আছে—

—অনেকেই? তা হবে, রজনী।

—আমি যে টাকার মানুষ

—কী চায় ওরা

—কিছু চায়

—তোমার স্ত্রী নেই ব'লে?

—টাকাওয়ালা মানুষ স্ত্রীসংসর্গ চায় ব'লে।

কী-রকম স্ত্রীসংসর্গ রজনী অবিশ্যি খুলে বল্লে না কিছু। আমিও জিজ্ঞেস করতে গেলাম না। এমন হতে পারে যে মেয়েটি রজনীর সম্পর্কীয়া কেউ, রজনী একা এত বড়ো বাড়িতে আছে; কলকাতায় আজকালকার এই ভাড়াবাড়ির দুর্ভিক্ষের দিনে নিজের বা নিজেদের দু'-এক জনের ব্যবহারের জন্যে কিছুটা স্থান যাতে পাওয়া যায় মেয়েটি সেই দাবি জানাচ্ছে হয়তো।

কিংবা আরও অন্য অনেক রকম কিছু হতে পারে বৈ-কি।

—এরা—এই সব মেয়েরা—দেখতে-শুনতে কী রকম।

—পাঁচ রকম।—রজনী বল্লে

—মানে?

—মানে সুন্দরী, কিংবা অল্প-বয়েসি মেয়ে আছে। তা-ও আছে।

—তোমার সঙ্গে কোথায় পরিচয় হয়েছিল এদের?

—নানা জায়গায়। যখন আমার টাকা ছিল না, এদের অনেকেই আমাকে চিনতে চাইত না, কিন্তু তাই ব'লে আমি না চিনবার ভান ক'রে এদের বিদায় দিই না।

—কী চায় এরা তোমার কাছে—টাকাকড়ি ছাড়া আর কিছু?

আমি সন্দিগ্ধ ভাবে রজনীর দিকে তাকালাম।

বারান্দায় একটা লাইট জ্বলছিল। রজনী আরও একটা জ্বালিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

—এখন ক'টা বেজেছে

—আটটা

—তুমি আজ বেরুবে না-কি, রজনী?

—না। তুমি আজ খাবে এখানে?

—রাত কাটাব ভাবছি।

—এইখানে? বড়ো বেশি মশা। তোমাদের কলেজ স্ট্রিটে তো মশা-ই নেই। কিন্তু বালিগঞ্জে—। মশারির যোগাড় দেখতে হবে তো তাহ'লে। একটি মশারি আছে শুধু আমার।

—মশারি না হ'লেও আমার চলবে

—সে তো ভালো কথা—বৃষোৎসর্গ হবে—দানমানের শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন; খবর দিয়ে এসো মশাদের।

রজনী আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—আমি ভেবেছিলাম মিনিট পনেরোর ভিতরেই আবার টেলিফোন বেজে উঠবে। বাজল না তো!

—কারু গাড়ি থামল না, রজনী?

রজনী মাথা কাত ক'রে কান পেতে শুনে বল্লে—ও—হ্যাঁ—তাহ'লে এসে পড়েছে—ফোন করল না আর—নিজেই এল—ও কে, জান! মেজো বয়সের বড়ো মেয়ে—

—কোথাকার? কোথায় পরিচয় হ'ল, রজনী?

রজনী হো হো ক'রে হেসে বল্লে—ওর আর আমার অন্নপ্রাশনের দিন থেকে ওর সঙ্গে আমার চেনা। ওরা বামুন, আমি কায়েত। ও তো আমাদের পাড়াগাঁর দেশের গাঁয়ের মেয়ে। এই বছর পাঁচেক হ'ল কলকাতায় এসেছে—জমিদারির লাটের ঠেলায় মন্বন্তরের গোঁত্তা খেয়ে—কলকাতায় এসে বাড়ি করতে পারছে না। ভাড়াটে বাড়িতে আছে—নতুন মোটর কিনতে পারছে না, বাপে-মেয়ে নিলেমের মাল খুঁজে বেড়ায়। একটা ছ্যাকড়া জীপ কিনছিল সে-দিন—আমি আমার চাঁদপারা ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম ওখান দিয়ে—ওদের দেখেই নেমে পড়লাম। সেই থেকেই হাসাহাসি ঢলাঢলি—তারপর ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে হে, নিখিল—

কাছেই দরজা খোলার শব্দ হ'ল। মুহূর্তের মধ্যেই মেয়েটি পরদা সরিয়ে বারান্দায় নেমে প'ড়ে আমাকে দেখে একটু ইতস্তত ক'রে তবুও ক্ষিপ্র সপ্রতিভতায় একটা সোফা দখল ক'রে বসল। একটা আশ্চর্য আতরের গন্ধে বাতাস ভারি হ'য়ে উঠল। ঈষৎ নারকীয় ঝাঁঝ-মিশ্রিত সেই স্বর্গীয় ঘ্রাণ নারীরূপ নিলে যে-রকম হয়, মেয়েটি দেখতে সেই রকম। আমি তাকিয়ে রইলাম।

—আমি ফোন করেছিলাম, রজনীবাবু

—আমাকে তো তুমি রজনীদাদা ব'লে ডাক, পারিজাত

পারিজাত আমার দিকে এক বার কটাক্ষপাত ক'রে যেন রজনীকে বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, লোকসমাজে তাকে 'দাদা' না ডেকে 'রজনীবাবু' ডাকাই হয়তো ঠিক। কিংবা কী বুঝিয়ে দিতে চাইল, রজনীই তা জানে।

—ফোন কেটে দিলেন কেন আপনি

—আমি নয়—নিখিলেশ কেটে দিয়েছে—রজনী আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল।

পারিজাত আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত মাধুর্যে হাসল এক বার, কিন্তু কোনও কৈফিয়ত চাইল না।

রজনীকে বল্লে—আমি ভেবেছিলাম রাগ করেছেন বুঝি?

—না, কেন রাগ করব? তোমার ওপর রাগ করবার ক্ষমতা কি শিবের আছে?

রজনী চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে?

—হ্যাঁ। আপনার দারোয়ান দোতলায় এসেছে। ঐ যে ঐ তো—

রজনী হাঁক দিয়ে বল্লে—মাধব না-কি?

—হুজুর!

—ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দাও

—হুজুর!

ব'লে সে নীচে নেমে গেল।

—অত টাকা ওর কাছে হবে?—পারিজাত জিজ্ঞেস করলে রজনীকে

—তা হবে নিশ্চয়ই। ট্যাক্সিতে চড়েছিলে কখন।

—দুপুর বেলাই—দু'টো নাগাদ। অনেক জায়গায় গিয়েছি

—একাই বেড়িয়েছ?

—সমরেশ ছিল

রজনীর মুখ এক-আধ মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

—আমি আর বাবা সেই জীপটা কিনেছি—

রজনী চুরুটে এক টান দিয়ে বল্লে—চুতিয়া—না কিনলেই পারতে—ওগুলোর স্পেয়ার-পার্টস পাওয়া কঠিন। আমি ভেবেছিলুম কী জান, পারিজাত, একটা মিনার্ভা কার হ'লে মানাত তোমাকে।

খানিকটা শ্লেষের চনমন ঝ'রে পড়ল রজনীর কণ্ঠ থেকে।

আমি আহত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম। কী দরকার পায়রাচাঁদার মতো মেয়েটাকে পাঁকের ভেতর ঠেসে—

কিন্তু পারিজাত উপলব্ধি করতে পারল না হয়তো, হয়তো গায়ে মাখল না; বল্লে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই—কলকাতায় জমি কিনতে পারছি না—যা দর! এক কাঠা সাত আট দশ বারো হাজার টাকা চাচ্ছে

—কলকাতায়? জমি কেনা দরকার? তোমার আর তোমার বাবার? কেন যাদবপুরে হ'লে হয় না—রিষড়া—কোন্নগর—ঝাড়গ্রাম—

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে বল্লে—বালিগঞ্জের বাইরে যেতে পারব না।

রজনী চপ্পলের ভিতর পা ঢুকিয়ে ডান পায়ের হাঁটুর ওপর বাঁ পা চড়িয়ে টিটকারি দিয়ে বল্লে—তা হ'লে আমার বাড়িটাই নাও। এটাই তো পাবার ইচ্ছে। নাও—আমি দু' হাজার টাকায় ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে।

রজনীর ভাবে ভঙ্গিতে ও ভাষার মাৎসর্যে আহত হয়ে পারিজাত অমর্যাদা বোধ করল না, স্বাভাবিক ভাবেই বল্লে—আজকালকার বাজারে আপনার বাড়ি দেড় লাখ টাকায় বিকোয়। কিন্তু অত টাকা আমরা পাব কোত্থেকে?—রজনীকে বল্লে পারিজাত।

—রয়ানগঞ্জের জমিদারির এই অবস্থা হ'ল শেষ পর্যন্ত

—জমিদারির কথা আর বলেন কেন? ও-প্রথাই তো উঠে যাচ্ছে

—যাচ্ছে তো। তবে কী করতে হবে! ব'লে বিরক্ত হয়ে পারিজাতের দিকে তাকাল রজনী।

—ও-দিক দিয়ে কিছু আর করবার নেই। আমি বলছিলাম কী—

—বালিগঞ্জে মর্টগেজি সম্পত্তি সস্তায় কিনে দিতে হবে তোমাদের, পারিজাত? তা-ই তো?

—তা যদি পারেন।

—তোমাদের তো কোনও ব্যাঙ্কও নেই

—তা নেই অবিশ্যি।

—ব্যাঙ্ক-এ রাখবার মতো টাকাই নেই হয়তো—

—বাবা বলতে পারেন। আপনার ব্যাঙ্ক-এ—

—টাকা জমা রাখলে ওভারড্রাফট চলে কি না? হোঃ হোঃ হোঃ

রজনী চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে—তুমি এখন ওঠ, নিখিল

—কেন?

—পারিজাতের সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি উঠছিলাম।

পারিজাত আমাকে ইশারা ক'রে ব'সে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বল্লে—এমন কিছু গোপন কথা নয় যে ওঁর সামনে বলা চলে না। ইনি তো আপনার বিশেষ বন্ধু, রজনীবাবু।

রজনী রাঘববোয়ালের মতো রোল ক'রে জেগে উঠে একটা উড়ন্ত নীলকণ্ঠের মতো নীল মাছির দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর চুরুটে দু'-একটা টান দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, বেশ।

আমার দিকে ফিরে রজনী বল্লে—কথা হ'ল এই যে, পারিজাতের সন্তান হচ্ছে। কিন্তু সে-সন্তানের পিতা আমি নই। অথচ আমাকে ওরা বাপে-মেয়েতে মিলে ইয়ে বানাতে চায়—মানে ওকে বিয়ে করতে হবে। সন্তানের পিতা যে সমরেশ সে-কথা পারিজাত রেখে-ঢেকে ব'লে আমাকে ফাঁপরে ফেলতে চেষ্টা করে নি—জিজ্ঞেস করা-মাত্র আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। এমনই ঝাড়াঝাপ্টা—কাজের মানুষ—মেজো তরফের বড়ো মেয়ে। এই মেয়েটি। নিখিল, এ-রকম মেয়েকে আমি বিয়ে করব কি, না—

ভাবছিলাম; আমার নিজের মনে বিশেষ কোনও সংস্কার ছিল না। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই পারিজাত অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে আমাকে বল্লে—আপনি হ'লে কী করতেন? বিয়ে করতেন, আমি ব'লে দিতে পারি।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে নালা-পুকুর-নদী যেমন জলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—জলের গন্ধে সহজ সরস জল ঝ'রে পড়তে থাকে তাদের কণ্ঠের থেকে তেম্নি ভাবে কথা বলছিল যেন মেয়েটি। কিন্তু তবুও মানুষ আমি, কঠিন চিন্তাশ্রয়ী, অকৃতার্থ। আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

রজনী বল্লে—কী হ'ল, নিখিল?

—ভেবে বলতে হবে আমাকে।

—তাহ'লে যাও, ভাবো গিয়ে। আমরা ঠিক ক'রে ফেলেছি।

অন্ধকারের ভিতর বেরিয়ে পড়লাম।

মাস কয়েক পরে রজনীর সঙ্গে দেখা হ'ল তার বাড়িতে; পারিজাতকে দেখলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার স্ত্রী কোথায়, রজনী?

—আমার স্ত্রী!—রজনী যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—বাঃ, পারিজাত—পারিজাতকে বিয়ে করেছিলে না?

রজনী অনেক দিন পরে যেন খাঁটি তামাশার খেউড় শুনছে, এমনি ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ডুকরে কেঁদে উঠল—হেসে উঠল। মনে হ'ল যেন সে সিদ্ধি খেয়ে চিৎকার করছে। অনেক ক্ষণ পরে নিরস্ত হয়ে ঠাণ্ডা গলায় রজনী বল্লে—বিয়ে করেছি কি না? তুমি যে সেই রাতে বেরিয়ে গেলে সে-রাত পারিজাত আমার এখানে ছিল—তার পর আরও ছ' মাস—রোজ রাতেই। তারপর ছেড়ে দিলাম।

রজনীর হাতে একটা ডিক্যান্টার ছিল। সে আমাকে টেনে নিয়ে ভিতরের কোঠায় একটা মস্ত বড়ো টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। টেবিলে নানা রকম মদের বোতল।

রজনী নেশা শুরু করল—ক্রমে চড়তে লাগল; —নিরবচ্ছিন্ন মুখখিস্তি করতে লাগল। রজনী যে শ্রীহট্টের মানুষ, তা আমি জানতাম। সিলেটী পরিভাষায় হৈ-হুল্লোড়ে হাসির চিৎকারে কী আছে আর—যা আছে জানা আছে আমার সব—উঠে যাচ্ছিলাম। সামনে হঠাৎ পারিজাতকে দেখে দ্বিতীয় বার তাকাবার আগে সে আমাকে ঘাড় ধ'রে বসিয়ে দিল। হাতটা রোমশ—রজনীর মতো—পুরুষের মতো—কালো মানুষের মতো। পারিজাত আমার কাঁধের থেকে হাত সরিয়ে নিলে খুব সম্ভব রজনী আমার ঘাড়ে হাত রেখেছিল। না—না—রজনী আমার ঘাড়ে হাত রাখে নি, রজনীগন্ধার ডাঁট এসে হাত রেখেছিল। পারিজাতকে আমি দেখলাম—আজ যেমন তাকালেই আকাশ দেখছি সেই রকম। রজনী টেবিলে মাথা রেখে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। পারিজাত আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেক একসঙ্গে ছিলাম। সত্যিই এমন হয়েছিল, আজ যেমন তাকালেই চার দিকে ফ্যাক্টরির চিমনির ধোঁয়া দেখছি, ওপরে চিল, নীচে ধর্মঘট—নিরাশা—কাদা—মৃত্যু—

রজনী নেই— ম'রে গেছে। পারিজাত কোথায়, জানি না। সমরেশ কোথায়, তা-ও জানি না। পারিজাতকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, ঠিক সেই রকমই দিব্য গন্ধ পেয়েছিলাম তার শরীরের থেকে শেষ বার যখন তাকে রজনীর ওখানে দেখেছিলাম। ঠিক ও-রকম একক আশ্চর্য ঘ্রাণ কোনও এসেন্সে আতরে বা অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত এ-পৃথিবীতে আমি অনুভব করি নি।

কাল অনেক রাতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ দিয়ে হাঁটছিলাম—কোন্ পথ খেয়াল ছিল না—কে যেন বল্লে ওই যে ফাঁড়ি। ফাঁড়ি?—কী হবে ফাঁড়ি দিয়ে? এটা কি উত্তর কলকাতা—না পশ্চিম—না কি দক্ষিণে এসে পড়েছি? বাইরের পৃথিবীর এ-রকম দু'-চারটে খোঁজ-খবর নিয়ে আমি আবার নির্মনস্কতায় অন্ধকারের ভিতর ডুবে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ মনে হ'ল একটা আশ্চর্য গন্ধ এই এখনও ছিল, এই এখুনি বাতাসে মিশে গেছে

যেন। সে-গন্ধ দু' বার এই পৃথিবীতে পেয়েছি আমি— এই তৃতীয় বার। কোথাও কোনও লোক দেখা গেল না—কোনও গাড়ি—রিকশ—কিছুই নেই। কিছু ক্ষণ আগে কারা যেন একটা শব মাথায় ক'রে নিয়ে গেল,—দেখেছিলাম। দেখেছি কি? যেন আর এক জন্মে দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে—কিংবা অন্য কোথাও—অনেক দিন আগে; আজ রাতে নয়। কিন্তু আজ রাতেও দেখেছি—যেমন মাথার ওপরে অভিজিৎ বিশাখা পুনর্বসু দেখছি, তেমনি নিতান্ত ভাবে; ঠিক পারিজাতের গায়ের সেই গন্ধ দু'-ধারের দেবদারু গাছের ফাঁকে রসা রোডের একানুগত পিচের রাস্তার চকচকে ট্রামলাইনের মার্বেলের মতন নিঃশব্দতায়—চারদিককার মহানুভব রাত্রির ভেতরে। কিন্তু ওরা কি পারিজাতের শব নিয়ে যাচ্ছিল? পা চালিয়ে হেঁটে কেওড়াতলায় গিয়ে দেখলাম দু'-তিন জায়গায় দাহ হচ্ছে। জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম দু'টো মেয়েমানুষের শবই বুড়িদের—বাকিটা এক জন যুবকের। তাকিয়ে দেখলাম যুবক পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করাতে আমারই নাম বল্লে তারা—মনে হ'ল আমারই নাম বলেছে—কিন্তু আমার নাম নয়, অন্য কারু নাম বলেছে, আমার এ-রকম ভুল কোনও দিন হত না, আজকালই হচ্ছে। কিন্তু পারিজাতকে রজনীর ওখানে প্রথম দেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশ কাল সন্ততির ওপর কেমন আঁধার আবরণ এসে পড়ছে যেন থেকে-থেকে—যেন যে-বাড়ির দেয়ালে চুনকাম নেই, সে-বাড়ির মুখোমুখি অন্য বাড়ির দেয়ালে সাদা চুনকামের উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছুই নেই, কেন যেন কেবলই মনে হতে থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও পথ নেই—চুনকামের উজ্জ্বলতা খারাপ লাগলে চুনকামের বিবর্ণতার দিকে তাকানো ছাড়া।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৪৬
নামকরণ কপিকারের
প্রথম লিখিত হবার কয়েক বছর পরে বহুল
পরিমাণে পরিমার্জিত হয়েছিল
বিশেষত শেষাংশ

বাঘিনি

সুমিত্রার চেহারা মন্দ নয়—কিন্তু কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে তার স্বামী—অনাদির—সঙ্গে কয়েক বছর ধ'রে জীবন ধারণ ক'রে জীবনের ধারণা তার বর্ণচোরা পতঙ্গের মতো চারদিককার ধূসরায়িত জিনিসের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সে বুঝেছে, এ-রকম অবস্থার ভিতরেই তার জন্ম হয়েছিল যেন (যদিও তা হয় নি)—এইখানেই তার সমাধি (কে জানে তা-ই বা হবে কি না?)। (সে যাই হোক) নিজেকে সে মানিয়ে নিয়েছে।

সুমিত্রার ছোট বোন শম্পার চেহারা তার দিদির চেয়ে আরও ভালো। বয়স উনিশ। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় এক কলেজে আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। শম্পার বিয়ে হয় নি এখনও। কে জানে সে বিয়ে করবে কি না! সে-ও পতঙ্গেরই মতন—কিন্তু এখনও উজ্জ্বল রৌদ্রের দিনের। হৃদয় তার খানিকটা নীল আকাশে রোদ রক্ত ও জলের গুঞ্জরণে উচ্ছলিত হয়েও—মাঝে-মাঝে নিজেরই ডানার ছায়াপাতে মানব-ইতিহাসের আমূল অন্ধকার, অব্যবস্থা দেখে ফেলেছে যেন—দেখে ফেলে জয় করতে চেয়েছে। (চায় নি কি?)—

চেয়েছে।

শম্পা এক দিন কলেজ থেকে ফিরে এসে বল্লে—দিদি—

সুমিত্রা অনাদির ছেঁড়া (জামা) পাঞ্জাবি সেলাই করছিল—সেলাই করতে গিয়ে এমনই ঘাড় গুঁজে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল চোখে (সে) দস্তুরমতো খারাপ দেখে—এক জোড়া চশমা পেলে ভালো হত তার।

—কলেজ হয়ে গেল—এরই মধ্যে?

—না। শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে, এখন টিফিন—

—তবে যে চ'লে এলে? কিছু খেতে? কোনও দিন

—না

সুমিত্রা অনাদির মৃত পাঞ্জাবিটার দিকে ফিরে তাকাল—সেলাই সে করছে বটে, কিন্তু সেলাই ক'রে এ-জিনিসটাকে জিইয়ে তোলা অসম্ভব

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

—আমাকে আর কলেজে যেতে হবে না

সুমিত্রা একটু ত্রস্ত ভাবে জামাটা সরিয়ে ফেলে বল্লে—কেন?

—মাস্টারমশাইরা আমার নাম ডাকেন নি আজ আর। আমার রোল-নম্বর এফ-নাইনটি-থ্রি—শম্পা রায়—আমার রোল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংরেজি কোনও ক্লাসেই ডাকা হয় নি—

সুমিত্রা একটু অবাক হয়ে নিজের কাজে মন দিয়ে বল্লে : ভুল হয়ে গেছে হয়তো। মনে করিয়ে দেবার কোনও উপায় ছিল না কি, শম্পা? তুমি হয়তো নিজে দাঁড়িয়ে—

—কী হবে দাঁড়িয়ে? কী লাভ হত প্রফেসরকে ব'লে?

সুমিত্রা সূচের ভিতর নতুন ক'রে সুতো ভরবার ফিকিরে ছিল।

—আমার রোল-নম্বর কেন ডাকা হচ্ছে না অফিসে তার কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালে ওরা হাসাহাসি করত না?

বল্লে—কেন?

—কেন? আমার নাম কাটা গেছে। শম্পা একটু ব্যাহত বোধ ক'রে, তবুও খানিকটা যেন নিস্তার পেয়ে, হাসতে লাগল।

—কাটা গেছে? সত্যি? যেন বিশেষ কিছু হয় নি এমন ভাবে সুমিত্রা শম্পার দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ। কলেজের পড়াশোনা তাহ'লে এখানেই শেষ, দিদি—

—আমি কিছু বলতে পারি না। তুমি—

—অনাদিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে? হ্যাঁ, তা করা হবে। কিন্তু—

—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে তোমার কথাবার্তা ব'লে আজই কিছু একটা করা উচিত।

—তোমার স্বামী অনাদিনাথ তো সন্ধ্যার সময় আসবেন—

সুমিত্রা ঈষৎ আহত ভাবে শম্পার দিকে তাকাল—বল্লে : শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ ক'রে আসছি কিছু দিন থেকে। হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময়ই আসবেন তোমার—

একটু থেমে গিয়ে সুমিত্রা বল্লে—আসবেন তোমার দিদির স্বামী। কিন্তু এর আগে তুমি কি কোথাও বেরিয়ে যেতে চাও? আমার মনে হয় তোমার অপেক্ষা করা উচিত; আজ না-ই বা বেরুলে? কেন তোমার নাম কাটা গেছে, শম্পা?

—খুব খারাপ কাজ করা হয়েছে

সুমিত্রা ভীত হয়ে বল্লে—কী করেছিল? কে করেছে?

—ছ' মাসের মাইনে দেওয়া হয় নি।

সুমিত্রা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেঁড়া জামাটা কোলের কাছে টেনে নিল আবার। বল্লে—আমি ভেবেছিলাম না জানি কীই-বা হয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়া তো!

শম্পা মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে জানালার ভিতর দিয়ে অনেক দূরে একটা বাড়ির গায়ে প্রকাণ্ড একটা লাল হ্যান্ডবিলের দিকে তাকিয়ে নিজের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা

পরীক্ষা করছিল। বড়ো হরফগুলোও ভালো ক'রে পড়তে পারা যাচ্ছিল না—প্রথম অক্ষরটা নিশ্চয়ই H কিন্তু Aও হতে পারে হয়তো—

কোনও একটা কিছু বিশ্রী জিনিস ঘটে যেতে পারত। সেলাই করতে-করতে সুমিত্রা বল্লে। শম্পার মনে হচ্ছিল খুব সম্ভব ওই অক্ষরটা A—নিজের কপালটাকে জানালার শিকের ওপর চেপে ধ'রে আবিষ্কারের সমুদ্রের দিকে পাঠিয়ে দিল সে তার দৃষ্টিকে—

—আমি জানি এ-রকম কত ঘটনা—সুমিত্রা শম্পার দিকে এক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্লে।

সুমিত্রা বল্লে—মেয়েদের নিয়ে ফোতো রঙ খেলবার ইচ্ছা চুতিয়া প্রমাণ করতে চাওয়া, অথচ নিজেদের মনের ভেতরেই লোভ রয়ে গেছে—

—লোভ?

—খুব খানদানি লোভ নয়, শম্পা। খুব ওঁচা—সুমিত্রা ঠোঁটে সূচ এঁটে নিয়ে বল্লে—কিন্তু একেবারে তলানি ঠেকিয়ে।

—লোভ? সাহস নয়?

—না।

—কিন্তু কী ক'রে জানলে তুমি? তুমি তো কোনও দিন কলেজে পড় নি

—সংস্পর্শে এসেছি। ছক নানা রকম থেকে যায়। যোগাযোগ ঘটবার অভাব কোথায় পৃথিবীতে। ও-সব কলেজ একটা উপলক্ষ মাত্র। প্রতিষ্ঠান আরও অনেক রকমের রয়ে গেছে।

সেই দূরের লাল হ্যান্ডবিলের দিকে ফিরে তাকাল আবার শম্পা। কেমন থোকা-থোকা জবা—না ঠিক নয় চুনির মতো লাল—অথবা হরিণের রক্তের মতো কেমন অফুরন্ত ভাবে দুপুরের রোদে ঝিকমিক করছে; কিন্তু কী যে লিখেছে—কারা লিখেছে—কীসের হ্যান্ডবিল কিছুই সে বুঝতে পারছে না এত দূর থেকে—তার চমৎকার চোখে অল্প শক্তি; শক্তি হৃদয়হীন ভাবে চমৎকার তবুও তো। অনেক তো—অশেষ তো কৌতূহল তার জীবনে—এবং সমস্ত কৌতূহল চেপে রেখে শক্তির অভাবনীয় দূরত্ব তবুও তো,—দুর্নিবার অন্ধতা।

—তুমি চিঠি পেয়েছিলে?

শম্পা চমকিত হয়ে সুমিত্রার দিকে তাকাল।

—আমার অহঙ্কারও আজ নেই। এক সময় না ছিল যে, তা নয়। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও সুন্দর। তোমাকে চিঠি লিখেছিল?

—কে?

—অনেকেই তো লেখে—

—কাকে

—লিখলেও সে-খবর আমরা কী ক'রে জানতে পারব আর। ছুঁচ ঠোঁটে রেখে কথা চলছিল এত ক্ষণ সুমিত্রার। ছুঁচটা খসিয়ে নিয়ে সুমিত্রা বল্লে—ছ' মাসের মাইনে এক-

সঙ্গে দিয়ে দেওয়া অসম্ভব—এক মাসের মাইনেও অনাদিবাবু কী ক'রে দেবেন ভাবছি তা-ই আমি। তোমাকে পড়ালে হত। কিন্তু ভালো লাগে কি তোমার?

শম্পা ছড়ানো পা দু'টো গুটিয়ে নিয়ে বল্লে, বাবা নেই—মা নেই—দাদা কোথায় গিয়েছেন—কোনও খোঁজ নেই তার—তোমাদের ওপর আর বেশি চাপ দেওয়া চলে না।

ডান পা মেঝের ওপর টানটান ক'রে পেতে রেখে তারপর আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে বল্লে—কিন্তু পড়ব আমি।

কিন্তু ভারি ঢিলে পছন্দে কথা বল্লে সে—কেমন যেন ড্যাবডেবে ঠেকল তার নিজের কথা তার নিজের কানে।

অনাদি বল্লে—নাম কেটে দিয়েছে? কবের থেকে?

—আজই।

কোনও বড়ো অফিসে কাজ করে না সে, কোনও মাঝারি চাকরিও জোটে নি তার। চুনোপুঁটিদের ভিড়েই অনাদিনাথ এক জন; তবুও একটা টাই ছিল তার। চিনেবাড়ির টাই খুলতে-খুলতে বল্লে—শম্পা কোথায়

—রয়েছে। ডাকব?

—না। অনাদি একটা টুলের ওপর বসল, পাশেই দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের ফ্যাকাশে অথচ হাঁসোড়ার (হাঁস + ঘোড়া) মতো মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিজের প্রতি অনুকম্পায় অধীর হয়ে উঠল না তবুও; কিছু সংবরণ ক'রে নিতে হ'ল না তাকে; কারণ সে অনেক দিন থেকেই সংবরিত, সম্বিৎ তার সব সময়ই রয়ে গেছে—কোনও সময়ে হারিয়ে ফেলে ফিরে পেতে হয় না আবার।

—চুপ ক'রে ব'সে আছ যে

—হেঁটে এসেছি। একটু বিশ্রাম। অনাদি প্রীত মুখে হেসে বল্লে

—ডেকচেয়ারে গিয়ে বসবে

—ঠিক সময়ে হবে সব। আমার জুতোর ফিতে খুলে দিতে হবে তোমাকে। কেন জান?

ফিতে খুলতে-খুলতে সুমিত্রা বল্লে—নুয়ে ফিতে খুলতে কষ্ট হয়; ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গেছে হয়তো?

অনাদি বল্লে—মাইনে দেয় নি ব'লে নাম কাটা গেছে?

বাঁ পায়ের জুতো খসিয়ে নিয়ে সুমিত্রা বল্লে—হ্যাঁ। ছ' মাসের বাকি পড়েছিল।

—শম্পা কি পড়তে চায়?

—পড়বার ইচ্ছা আছে

—অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে দেখা যেতে পারে।

—তিনি কে?

—ছ' মাসের মাইনে খারিজ ক'রে দিতে পারেন। ফ্রি স্টুডেন্টশিপও—

শম্পা কখন এসে দাঁড়িয়েছে চালশে ধরেছে ব'লে আবছায়ার ভিতর কেউ তা টের পায় নি। অনাদিনাথের মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই দীর্ঘ তনিমা এসে দাঁড়াল। এমন অনেক দিনই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এ-তনিমা কে—পুরুষের হৃদয়ের ওপর এর কী রকম প্রভাব সম্ভব হতে পারে সে-সব কথা কোনও দিন বিচার ক'রে বুঝে দেখতে যায় নি অনাদি। আজও সে একটা জ্যামিতির বিস্তার দেখল শুধু; শুনল সেই ছায়াচ্ছন্ন রেখাগুলো (যেন) তাকে বলছে—তা হতে পারে না, অনাদিবাবু

সুমিত্রা ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে বল্লে—ওকে তুমি নাম ধ'রে না ডাকলেও পারতে, শম্পা।

—অবনীবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি—অনাদি বল্লে

—শুনেছি আমি। কিন্তু ও-রকম ভাবে ছ' মাসের মাইনে বাতিল করা ঠিক হবে না।

—কিন্তু যাদের টাকাকড়ি আছে, তারাও তো নানা রকম সুবিধা ক'রে নিচ্ছে আজকাল। তা-ই যদি হয়, আমাদের অবস্থা মনে ক'রে এটা কি উচিত মনে কর না তুমি—

অন্য দিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শম্পা বল্লে—না।

—অবনীর সঙ্গে আমি কলেজে পড়েছিলুম।

সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে অনাদি নিজের গলার কণ্ঠায় এক বার হাত বুলিয়ে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে একটা লবঙ্গ খেতে-খেতে বল্লে, জানি না এখনও সে আমাকে মনে ক'রে রেখেছে কি না। সে আজ বড়ো উকিল, কলেজ-কমিটির প্রেসিডেন্ট। কিন্তু—

—ছ' মাসের মাইনে দিয়ে দিতে হয়। শম্পা বল্লে

—কে দেবে? সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল।

শম্পা কোনও উত্তর দিল না।

অনাদি বল্লে—কলেজে প'ড়ে লাভ নেই কিছু। কিন্তু তবুও—যখন—তোমার পড়বার ইচ্ছে আছে।

—কিন্তু বিনে-মাইনেতে আমি পড়ব না।

—তোমার বাবা নেই—হাফ-ফ্রীতে তোমার রাজি হওয়া উচিত

—আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি, শম্পা বল্লে।

শুনে আশ্চর্য হয়ে অনাদি বল্লে—কোথায়?

—একটা মস্ত বড়ো ফার্মাসিতে—

—ফার্মাসিতে! সে আকাশ থেকে প'ড়ে বল্লে—তা কী ক'রে হয়! ওদের ওষুধপত্র তেল-মালিশ ক্যানভাসিং করতে হবে হয়তো! ক্যানভাসিং করাটা কি উচিত তোমার

—না, ও-সব কিছু নয়। ক্যানভাসিং নয়। সঙ্গে আরও দু'-এক জন আছে। আমার বন্ধু। আমাদের কলেজের মেয়ে। (ক্যানভাসিং নয়।) অফিসের কাজ করতে হবে। ভিতরে ব'সে। বাইরে যাবার বিশেষ কোনও দরকার নেই। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে না গেলে।

—তুমি স্টেনোটাইপিস্ট? শম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে অনাদি জিজ্ঞেস করল। অনাদির দু'টো ঠোঁটের ব্যবধান ধীরে-ধীরে ক্রমায়ত হতে-হতে যখন চূড়ান্তে পৌঁছুল তখন সে একটা ঢোঁক গিলে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল : আমি তো জানতাম না, শম্পা। তুমি এ-সব শিখেছ কবে?

—শর্টহ্যান্ড আমি শিখি নি।

—টাইপিং?

—ও-সবের দরকার হবে না। আমি টাইপিস্টের কাজ নেই নি। একটা ডিপার্টমেন্টের জিনিসপত্রের হিসেব রাখব আমি, চিঠিপত্রের বিলিব্যবস্থা করব—আরও কতকগুলো এ-রকম ধরনের কাজ আছে—

—মাইনে কত? সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল।

—এখন পঁচাত্তর দেবে।

—পুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে হয়তো?

—সম্পর্কে আসতে হবে।

—সেটা কি ঠিক হবে?

—এ ছাড়া কোনও উপায় নেই

—তোমাকে কি চাকরি করতেই হবে।

—এর চেয়ে ভালো কাজ পেলে ঠিক হত। পরে পাওয়া যাবে হয়তো।

—তোমার রূপ রয়েছে। এ-রকম ভাবে চাকরি করা তোমার অন্যায়। সুমিত্রা বল্লে।

শম্পার রূপের সম্পর্কে অনাদির কোনও গূঢ় নিগূঢ় মিনেকাটা মনোজগৎ—যা গড়লেও গড়া হতে পারত—তৈরি হয়ে ওঠে নি এত দিনেও—কোনও স্থূলতা তো মনের ত্রিসীমায়ও ছিল না তার। তার স্ত্রীর সম্পর্কেও এ-সব কিছু ছিল না তার। অবশ্য তাদের একটি সন্তান রয়েছে—কিন্তু কোনও নিছক মোটা বা মিহি কারণে তার আবির্ভাব হয়েছে সেটা মনে করতে যাওয়া ভুল। তবুও শম্পার দিকে ফিরে অনাদি বল্লে— তোমার দিদি ঠিকই বলেছে—তুমি এ-চাকরি না করলেই পারতে। এটা তো মেয়েদের ফার্মেসি নয়।

পর দিন সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরল অনাদি একটা খবরের-কাগজ হাতে ক'রে।

সুমিত্রা বল্লে—বুঝি বিকেলের কাগজ কেনা হয়েছে?

—হ্যাঁ। টাই খুলতে-খুলতে বল্লে অনাদি—খবরের-কাগজ আমার পড়া চাই।

—তা তো ঠিকই, কিন্তু সকালে যেটা কেনা হয়েছিল—

—এ বিকেলের খবর।

—আরও বেশি খবর দিয়েছে?

—তাজা বেশি ঠিক নয়—খানিক পুরোনো—খানিক নতুন

—নতুন সব টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ, নতুন আছে। বিকেলের কাগজ। নতুন খবর আছে কিছু। কেবল খবর-টবরই যে আমি কুড়িয়ে বেড়াব সে-ধাতের লোক আমি নই। সেটা আমি ভালোবাসি না। কিন্তু সারা দিনের তাড়াহুড়োর পরে একটা-কিছু চাই—

—কী চাই

—একটা-কিছু—আমি তো সিনেমায় যাই না।

—সিনেমা ছাড়া আর কিছু নেই?

—কীই-বা থাকবে আর। এক মুখ অন্ধকার নিয়ে—তবুও ফ্যাকাশে মুখে—হাই তুলতে-তুলতে বল্লে অনাদি। একটা টুলের ওপর ব'সে প'ড়ে বল্লে, কেউ-কেউ মদ খায়

শুনে সুমিত্রার উৎকণ্ঠিত হবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ মদ খেতে হলে যে-বাপের যে-ছেলে হওয়া প্রয়োজন অনাদির চোখে মুখে অন্তরাত্মায় সে-ছাপ কোনও বিষাক্ত মুহূর্তেও খুঁজে পায় নি সুমিত্রা। না পেয়ে—জীবনের অতি তিক্ত দু'-এক মুহূর্তে—কিছু ক্ষণের জন্যে একটু দিশাহারা বোধ করতে হয়েছে সুমিত্রাকে। কিন্তু তবুও তার অফিসী মানুষের বেঘোর ক্লান্তি আঘাত করল সুমিত্রাকে। অনাদি মদ খাবে না কোনও দিনও—সমাধিস্থ হয়ে অলাতচক্রেও পাক খাবে না, কিন্তু এখুনি তার—একটু গরম চায়ের দরকার, গরম-গরম খাবার পেলেও ভালো হয়। বোধ করছিল সুমিত্রা।

—জুতোর ফিতে খুলে দিতে হবে না? ব'সে আছ যে?

—বিশ্রাম করছি। খোলো ফিতে।

—শম্পা এখনও আসে নি।

—অফিস থেকে আবার কোথাও গেল না-কি?

—বলতে পারছি না। ভাবালে মেয়েটা—

—ব্লাডপ্রেশার—তাই নুয়ে ফিতে খুলতে পারি না। নুয়ে আবার উঠতে গেলেই কেমন ধাক্কা মারে

—বটব্যালকে দেখিয়েছিলে?

—এই বার ডান পায়ের জুতোটা—না, বটব্যালকে দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। ওরা সকলেই বিশ্রাম করতে বলে।

—বেশ তো, ছুটি নাও

—তুমি একটু চা ক'রে নিয়ে এসো।

—চা'র সঙ্গে—

—কিছু খাবার-টাবার—

—বাজারের?

—ঘরের তৈরি হ'লেই ভালো

—চিঁড়ে ভেজে দেব?

—কাঁচা পাঁউরুটি স্লাইস ক'রে মাখন মাখিয়ে দিলে মন্দ হত না। পাঁউরুটি নেই হয়তো। আছে? মাখন ফুরিয়ে গেছে? এই মোড়ের দোকানে পাওয়া যাবে। কাকে আনতে পাঠাবে সেই তো কথা। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। না,না। এতে ব্লাডপ্রেশার-এর কী আর হবে—সারা দিন অফিসের ঝামেলার পর। এই যে শম্পা—তোমার এত দেরি হ'ল কেন : অফিস ক'টা অব্দি—ক'টার থেকে?

অনাদি টুলের ওপর ব'সে পড়ল।

—এই গলির থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তার মোড়ে সেন ব্রাদার্স-এ মাখন পাওয়া যায়, শম্পা—সুমিত্রা বল্লে—

—খুচরো মাখন?—শম্পা অনাদিকে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। কোয়ার্টার পাউণ্ড। কিনে আনতে পারবে? কোনও কাউকে দেখছি না তো এখন আর। টাকা দেব? অনাদি বল্লে।

শম্পা মাখন নিয়ে ফিরে এসে দেখল অনাদি একটা আধ-ময়লা খদ্দরের ফতুয়া গায়ে দিয়ে ডেকচেয়ারে ব'সে পড়েছে। মুখে সাবান মাখা হয়েছিল হয়তো—তারপর ধুন্দুলের ছাল কিংবা তোয়ালে দিয়ে রগড়ানো হয়েছে (খুব সম্ভব)—যে-রকম রোজ হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; অনাদির মেটে রঙের মুখ বাতির আলোয় কেমন লকলক ক'রে উঠছে—এই সময় এই আলোয় ঠিক এই-এই রকমই লকচক করে রোজ; দেখতে-দেখতে হায়রান হয়ে গেছে শম্পা; এক দুই তিন চার পাঁচ বছর ব'সে এই-ই তো দেখছে। এই-ই তো। কিন্তু সারা দিন একটা আজব ফার্মাসিতে কাজ ক'রে এসে অনাদির একঘেয়েমি একটু নতুন ক'রে ধাক্কা দিল তাকে।

ওদের সকলের চা খাওয়া হয়ে গেলে অনাদি খবরের-কাগজ নিয়ে ডেকচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল, পা ছড়িয়ে দিল একটা কেরোসিন কাঠের টুলের ওপর।

—সারা দিন অফিসে কী করলে? সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল শম্পাকে

—অনাদিবাবু কি কাগজ পড়ছেন?

—বিকেলের একটা পেপার।

—কোনও নতুন খবর আছে?

—তেমন কিছু নেই হয়তো। থাকলে আমাদের জানিয়ে দিতেন।

—কোনও খবরেই আমাদের কিছু এসে যাবে না—অনাদি তার কাগজের ও-পিঠের থেকে বল্লে—

—শম্পা ঘুমিয়ে পড়ছে হয়তো—সুমিত্রা পাখার বাতাস খেতে-খেতে থেমে গিয়ে বল্লে।

—না—ঘুমোচ্ছি না। ভাবছিলুম।

—কোথায় পেলে মাখন? সেন ব্রাদার্স-এ? অনাদি জিজ্ঞেস করল।

—না—এ-পাড়ায় নেই—মল্লিক স্টোর্স থেকে আনতে হয়েছে

—বাবা—অদ্দুর! হেঁটে গেলে তুমি! শম্পা দাঙ্গাবাজ তো কম না

কতকগুলো হেঁজিপেঁজি খবর দেখা হয়ে গেছে তার—অনাদি খবরের-কাগজের নিজস্ব মন্তব্যগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

—শম্পা, ঘুমিয়ে পড়ছ তো আবার! এটা ভালো নয়। ওঠো, ওঠো। সুমিত্রা তাকে সজাগ ক'রে রাখতে চাইল।

—না, ঘুমোই নি। চলো—তোমরা যাবে?

—কোথায়?

—একটু বেড়িয়ে আসি—

—এত রাতে! এখন সাড়ে-আটটা বেজেছে! অবাক হয়ে বল্লে সুমিত্রা।

—এত রাতে! শম্পার হঠকারিতায় বিমূঢ় হয়ে খবরের-কাগজের আড়ালে নিস্তব্ধ হয়ে রইল অনাদি। ঘুমের ভিতর দিয়েই ওরা খেতে বসল গিয়ে—এবং ঘুমোতে-ঘুমোতে অবশেষে আর দশ জনের মতন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

শম্পা তাকিয়ে দেখছিল কারা যেন কার্ডবোর্ড বাক্সে ওষুধের শিশি ভ'রে রাখছে। এই-ই শুধু দেখছিল কি সে? না, আরও কিছু দেখছিল।

কখন কে যে তার কাঁধের ওপর হাত রেখেছে, টের পেল না সে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নির্মলা বল্লে—শম্পা, তোমাকে সেন সাহেব ডেকেছেন। চৌরঙ্গী সাহেব—মানে, মিস্টার সেন, অভিমন্যু সেন। কে তার নাম চৌরঙ্গী—চৌরঙ্গী সাহেব রেখেছে—শম্পা নির্মলা অফিসের অনেকেই তা জানে না।

—কোথায় তিনি?

—তাঁর কামরায়।

—সেখানে আমাকে যেতে হবে? শম্পা একটু ইতস্তত ক'রে বল্লে।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা আছে—

—কিন্তু—শম্পা কার্ডবোর্ড বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে ব'সেই রইল, নির্মলাকে বল্লে—তুমি যাও—

—আর তুমি?—

—(আমি) যাচ্ছি—

কিন্তু সে-দিন সেনের কামরায় গিয়ে অফিসের দরকারি কাজকর্মের হিসেব দিতে ভুলে গেল শম্পা। সেন সাহেবও ভুলে গেলেন কাউকে তিনি ডেকেছিলেন কি না তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। নির্মলাকেও তার নিজের দিককার কাজ-অকাজের ভিড়ের ভিতর এত বেশি ডুবে থাকতে হল যে শম্পার সঙ্গে দেখা করবার কোনও অবসরই আর খুঁজে পেল না সে।

পর-পর চার-পাঁচ দিন এই রকমই হল।

কিন্তু তার পরের দিন নির্মলা এসে ডাক দিতেই শম্পা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—সেন কে? মালিক?

—না, মালিক নয়। তবে হ্যাঁ, এক রকম মালিক বৈ-কি? এক জন বড়ো অফিসার তিনি।

—আমি কি তাঁকে দেখেছি?

—তা আমি কী ক'রে বলব?

—যে-লোকটা খুব ভারিক্কি চালে তত্ত্বতলব ক'রে বেড়ায়; ছড়ি দিয়ে কয়েকটা কার্ডবোর্ড বাক্স শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে আবার ছড়িপেটা ক'রে মেঝের ওপর নাবিয়ে আনল সে-দিন—সে-ই কি সেন? তুমি দেখ নি, নির্মলা? অনেকেই তো ছিল সে-সময়—

—হ্যাঁ, দেখেছি ব'লেই তো, হ্যাঁ, দেখেছি বৈ-কি, মনে পড়ছে। ওঃ, তিনি হলেন বোস মজুমদার। সেন নিজে কামরার থেকে বেরোন না বড়ো একটা।

—তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়

—আমাকে ফুটফরমাসের জন্য ও-দিকে যেতে হয়।

শম্পা একটু ভেবে বল্লে—এই যে অফিসের এই কাজ, এ আমি পছন্দ করি না।

—তাহ'লে কী করবে তুমি?

—খুব বেশি খাটুনি নয় অবিশ্যি। কিন্তু আমাদের মনের ধাঁজ আলাদা। ঠিক হয়ে আসছে বটে, কিন্তু আরও কয়েকটা বছর লাগবে অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের মতন হয়ে যেতে। আমি যে এখানে অফিসে আমার নিজের কাজ করছি এর মানে ওদের সঙ্গেও মাঝে-মাঝে আমায় দেখা করতে হবে?

—হপ্তায় এক দিন হয়তো। এত বড়ো একটা অফিসে এ ছাড়া কী ক'রে চলে।

—আমাকে ডাকা হয়েছে কেন?

—না গেলে কী ক'রে জানবে? আমি জানি না।

—হয়তো কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য—

—বলতে পারি না। হয়তো অন্য ডিপার্টমেন্ট-এ পাঠিয়ে দিতে পারেন—

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

—অন্য ডিপার্টমেন্ট-এ গেলে তোমার উন্নতি হতে পারে।

—যাচ্ছি। কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক এমন কী আকাট বিলিতি হয়ে যেতে পারেন যে আমাদের এখানে এক-আধ সেকেন্ডের জন্য আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—সামনেই যেতে হবে তাঁর—বলতে-বলতে শম্পা উঠে দাঁড়াল।

—তোমার মাইনে বেড়ে যেতে পারে অন্য ডিপার্টমেন্ট-এ গেলে। রমলা পঁচাত্তর টাকায় শুরু করেছিল। এখন দু'শো পাচ্ছে।

—আমি যাচ্ছি—

—চলো আমার সঙ্গে—

—আমি যাচ্ছি—কিন্তু কোনও মাইনের ধকলে প'ড়ে নয়

—বেশ তো চলো—

নির্মলা চ'লে গেলে মিস্টার সেন বল্লেন—বসুন। আপনার নাম কি শম্পা চৌধুরী

—হ্যাঁ।

লিখতে-লিখতে একটু হেসে বল্লেন—আমি অভিধান খুঁজে দেখি নি অবিশ্যি—

লিখতে-লিখতে সেন নিজের নিরস্ত কলমের দিকে এক বার তাকিয়ে বল্লেন—আমাদের দিশি পুরাণের গল্পও আমার খুব বেশি জানা নেই—

শম্পার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লেন—নেহাৎ কমও জানি না। কিন্তু শম্পা নামের অর্থ কী? শম্পা? কী অর্থ হতে পারে এ-নামের।

শম্পা কোনও উত্তর দিল না।

সেন অচ্ছোদসরসীর মতো হেসে শম্পার দিকে না তাকিয়েই বল্লেন—কিন্তু আপনার নামের পম্পা—পম্পা তো একটা নদী?—আপনার নামের—আমার বাস্তবিকই খুব ভালো লেগেছে। পম্পা—ইয়ে ফোনেটিক পম্পোসিটি। শম্পা?

ভ্রূকুটি ক'রে সেন সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় পুরাণের সমুদ্রে কোনও একটা মধুর দ্বীপ আবিষ্কার করবার নির্লক্ষ্য ব্যস্ততায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনে করতে পারা যেত। কিন্তু কিছুই তাঁর লক্ষ্যহীন নয়।

—আমার একটা স্কিম রয়েছে— সেন শুরু করলেন—

টেবিলের টেলিফোন রিসিভারের দিকে তাকিয়ে শম্পা চুপ ক'রে রইল—

—আপনি ইংরেজিতে বেশ দোরস্ত চিঠি লিখতে পারেন

শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে—আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি শুধু

—ওঃ, কিন্তু কারু-কারু ইংরিজিতে বেশ এলেম থাকে।

—আমি সায়ান্স্ নিয়েছিলুম—

—আপনি শর্টহ্যান্ড শিখেছিলেন হয়তো—

—সায়ান্স ক্লাসে?—শম্পার ঠোঁট চোখ ঈষৎ পরিহাসে কুঁচকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—না—না—এম্নি—

—আমি শিখি নি—

—টাইপ করতে জানেন নিশ্চয়ই

শম্পা ঘাড় কাত ক'রে নিজের ডান হাতের ওপর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে সে-দিকে তাকিয়ে থেকে অবসন্ন ভাবে বল্লে—একেবারেই জানি না।

একটু চিন্তিত হয়ে সেন বল্লেন—শিখে নিতে পারেন?

একটু চুপ থেকে শম্পা বল্লে—কী শিখে নিতে হবে—

—স্টেনোটাইপিং

শম্পা ব্যাহত হয়ে বল্লে—ও-দিকে আমার রুচি নেই। কী হবে শিখে? কিন্তু শিখবার সময় কোথায় আমার?

—আমি সময় ক'রে দিচ্ছি। রোজ একটা অব্দি এখানে কাজ ক'রে আপনি ছুটি পাবেন। তারপর আমাদের অফিসের দোতলায় দক্ষিণ দিকের সব-চেয়ে শেষ ঘরটায় কমার্শিয়াল ক্লাস খোলা হয়েছে মেয়েদের জন্যে—সেইখানে—

শম্পা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—সে হবে না।

—বসুন।

—স্টেনোটাইপিস্ট-এর দরকার আপনার?

—এই অফিসে অনেক রয়েছে; কিন্তু যত বেশি পাওয়া যায় ততই—

—বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগাড় করতে পারা যায়

—আমাদের দেশের মেয়েরা চাকরি করছে আজকাল। কিন্তু তাদের ভিতর স্কিল্‌ড লেবার কম—

—আশা করা যায় ক্রমেই বাড়তে থাকবে—

—কিন্তু আ... তো কোনও ভরসা দিলেন না—

—আমি কারু সেক্রেটারি হতে চাই না—

—কিন্তু তাতে চাকরির উন্নতি হত—

—আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—

—বসুন। আপনি নিজেকে চেনেন না হয়তো।

শম্পা একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি ব'সে-থাকা লোকটার ধরাছোঁয়ার বাইরে আড়ালে খানিক হেসে নিয়ে দেয়ালের একটা জিন-দানবীয় ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। নিজেকে সে নিজে চেনে কি, না চেনে না? চেনে হয়তো, আধো-চেনে; ওকে কি চেনা বলা যায়? শম্পা তার নাম; এ-নামের কী অর্থ নিজেই সে কি জানে? কে তাকে দিয়েছিল এই নাম? কেন দিয়েছিল? এ-নামের কোনও অর্থ নেই—কিছু ইঙ্গিত আছে : কী সে ইঙ্গিত? কিন্তু ইঙ্গিত ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়ে অর্থহীন কেন? অরুণ বলেছিল কবিতায় একটা রকম আছে যাকে বলে সুররিয়ালিজম। তার জীবনটাও কি তা-ই? ধ্বনি আছে, কিন্তু অর্থ কী তার? ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু লোকায়ত পৃথিবীতে কী ক'রে সে-আভাসিক বহিরাশ্রয়িতাকে ভাঙিয়ে খাওয়া যেতে পারে? খাওয়া? খে... বৈ-কি? খাওয়াই কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয় জীবনের? মিস্টার সেন আজও ঠিক ... পারছেন না হয়তো—টাকা চিবিয়ে খাচ্ছেন। শম্পা নিজেও কিছু গুছিয়ে খেতে পারছে না এখনও—আভাস ইঙ্গিত নিঙড়ে দুঃসাধ্য কাল নিঙড়ে কখনও কি শরীরের স্বাদ মেটে—অরুণের সুররি...লিজম-এর কোনও মর্যাদা টিকে থাকে এই বাঘের শেয়ালের কাকাতুয়া কাকের পৃথিবীতে?

শম্পা চমকে উঠে শুনল সেন বলছেন—আপনাকে বসিয়ে দিতে পার...—

—কোথায়?

—এই অফিসে—অন্য অফিসে

—অন্য অফিসে

—হ্যাঁ, গুণীদের দাম ক্রমেই চড়তে থাকবে—মেয়েদের বেলায় আরও বেশি—টাইপরাইটার আছে আপনার?

—না

—আমি অফিস থেকে ধার দিতে পারি। বাড়িতে ব'সে শিখতে পারবেন?

শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে—ও-রকম ভাবে শিখে কী লাভ?

—আমি ভালো মাস্টার পাঠিয়ে দেব।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মোটেই আপনার সহানুভূতির যোগ্য নই। আপনার অনেক কাজের ক্ষতি করা গেল।

—কিছুই না, আমি প্ল্যানিং নিয়ে আছি—

শম্পা অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের টেলিফোন রিসিভারটা তুলতে গিয়ে আবার রেখে দিল।

—আপনার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত যে কথা বলছি, এ আমার নিজের কাজ—অফিসের কাজ—প্ল্যানিংকে পারফেক্ট ক'রে তোলবার প্রয়াস।

—কিন্তু সে-পরিকল্পনায় টাইপরাইটার ছাড়া কি আর কিছু নেই। হঠাৎ ব'লে ফেলল শম্পা। মুখে খানিকটা রঙের তুষ-ছাই হাওয়ায় ঝিলিক দিয়ে উঠে খেলা ক'রে গেল যেন তার; লজ্জায় ঠিক নয়, ঠাট্টায়ও নয়—তবুও খানিকটা ইয়ার্কিরই আমেজে যেন।

শম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন নি অবিশ্যি সেন। সত্যিই খোড়েল মানুষ সেন? কিংবা হয়তো তা নয়—মন্দ নয় লোকটা। টাকা আছে অনেক, বিয়ে করে নি. অরুণের সুররিয়ালিজম-এর কোনও মানে হয় না, সংসার নেই তার, পোলিটিকস-এর একটা ব্যর্থ পাড়ায় সারা দিন ঘুরে বেড়ায় সে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল শম্পার মন, অরুণকে অবিশ্যি পরে বুঝে দেখবার অবসর থাকবে ঢের—কিন্তু সম্প্রতি এই লোকটি লিখে চলেছে, কী লিখছে—কী ওর সরল সুঠাম কিমাকার পরিকল্পনা একটা ওষুধের কারবার চালাতে গিয়ে

—না, টাইপরাইটার ছাড়া আরও অনেক জিনিস আছে। আপনি তো সায়ান্স সবে শুরু করেছিলেন। কেমিক্যাল রিসার্চ করবার সুযোগ কোথায় আপনার।

সেন বেল টিপলেন। বেয়ারা এসে একটা স্লিপ নিয়ে বাইরে চ'লে গেল। মুহূর্তেই দু'জন ছিমছাম আধবুড়ো ইয়ার ঘরে ঢুকে অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্যে চেয়ার দখল ক'রে বসতেই সেন আরও খানিকটা গম্ভীর—ওদের চেয়েও আরও এক কাঠি গম্ভীর—হয়ে কাকে যে একটা বিদায়-নমস্কার জানালেন কেউ তা বুঝতে পারল না, বুঝতে চাইলও না। সেন সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে শম্পা অবাক হয়ে ভাবছিল অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে সেন যে তাকে বিদায় জানালেন—এটা কি তাঁর উচিত হ'ল : সে কি এই চাকরি ছেড়ে দেবে?

চাকরি ছাড়ল না শম্পা—কালই তো সেন আবার তাকে ডেকে পাঠাবেন। কিংবা পরশু, কিংবা তার পর দিন—কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে। মাসে-মাসে সেন কিছি পাগাত্তর

টাকা মাইনে পেয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সেই বড়ো পরিকল্পনার মহনীয় ঘুঘুর সঙ্গে আমার কি আর দেখা হবে না? সে বিস্মিত বিস্রস্ত হয়ে ভাবত রোজই প্রায়। সেনের কামরার দিকেও মাঝে-মাঝে সে এগিয়ে গিয়ে—থেমে—ফিরে এসেছে। কিন্তু মিস্টার সেন এত দিনেও আর তাকে ডাকেন নি। কিন্তু—তবুও একটা জিনিস লক্ষ করেছে শম্পা—কোনও দিক থেকে কেউ কোনও দিন কোনও রকমে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতেও আসে নি। ব্যতিব্যস্ত হয়ে অনেক মেয়েকে কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হয়েছে। কিন্তু শম্পার সুখের চাকরি, বাড়ি থেকে চার-পাঁচ মিনিট হেঁটেই অফিস পাওয়া যায়;অফিসে প্রায় যে-কোনও সময় এলেই হয়;এসে বিশেষ কোনও কাজ নেই। একটা ডেকচেয়ার রয়েছে—ইচ্ছে হ'লে বস তুমি; যত ক্ষণ খুশি ব'সে থাক। ব'সেই থাকে শম্পা। জানালার ভিতর দিয়ে কলকাতার দুপুরের চিল, ফুরফুর ক'রে উড়ে আসা ট্রেডউইন্ড বিলিতি কামুলাস মেঘ, দিশি পুষ্কর-টুষ্কর, ঊনপঞ্চাশ বাতাস, সকালের ফিকে নীল কমলাফুলি রোদ—মিনার—ছাদ—ফ্যাক্টরি—ব্যাঙ্ক কুড়িয়ে সে সারা দিন—কিছু পড়াশোনা ক'রে—কিছু ক'রে কাজের তদারক—যখন খুশি চ'লে যায়। জানে এ-সবের ভিতর কিছু নেই—কিছুই নেই—নেই। কিন্তু তবু কী থাকতে পারে আর অন্য কোন্ সব জিনিসের ভিতর?

কয়েক জন প্রেমিক আছে তার; কিন্তু অনেকেই গরিব; যারা গরিব নয় তাদের ইতরতা—

—শম্পা, তোমাকে ডাকছেন

—কে, নির্মলা? আমাকে! কে ডাকছেন

—মিস্টার সেন

—আমাকে? কেন?

—চলো

—এখুনি যেতে হবে?

—ভয়ঙ্কর ব্যস্ত আজ

হাঁটতে-হাঁটতে শম্পা বল্লে—তুমি নাকি আজকাল টাইপ কর, নির্মলা

—হ্যাঁ, একেবারে ব্লাইন্ড

—কী রকম স্পীড

—মিনিটে ত্রিশ

—শিখলে কী ক'রে?

—না শিখে উপায় নেই। খাটুনি কম নয়—তবে শ' দেড়েক পাচ্ছি, মে-জুনে দু' শো হয়ে যাবে আশা করি। আচ্ছা, আমি তাহ'লে চল্লুম। দক্ষিণবিসারী ডানা ধ'রে বাঁ দিকের অন্ধকার করিডরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল নির্মলা।

সেন সাহেবের ঘরের থেকে পাঁচ হাত দূরে বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট ক'রে শম্পা এক-আধ মুহূর্ত কী যেন ভাবল।

ঘরে ঢুকে জায়গা ক'রে নিতেই সেন মুখ তুলে তাকিয়ে বল্লেন—এই যে আপনি, বসুন।

—নির্মলা বলছিল—

—হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলুম আমি। এটা আমার অন্যায়। এক-আধ বার আপনাদের ও-দিকে ঘুরে এসেও তো কাজের কথা জানানো যায়। বড্ড সেডেন্টারি হয়ে গেছি। আসতে হয়—আমি যেতে পারি না।

শম্পা টেলিফোনের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল কাউকে টেলিফোন করা যেতে পারে হয়তো—সমরেশকে, কমলাক্ষকে, অরুণকে; বলা যেতে পারে : আমি...ফার্মেসির বড়ো সাহেবের কামরায় আছি—একটা মস্ত বড়ো পরিকল্পনার ইন্দ্রধনুকের বর্ণালি আমাদের চোখে? না কি তার মাকড়ের জালের ভিতর সোনালি মাছির মতো সেন, ঊর্ণনাভের মতো অফিস? সোনালি মাছির মতো আমি—ঊর্ণনাভের মতো সেন?

—আপনাকে একটা নতুন কাজ দিতে পারি। করতে রাজি হবেন তো?

—কাজ কী রকম?

—মাইনে কী রকম জানবার দরকার নেই হয়তো?—

—মাইনের চেয়ে আমি অবসর বেশি ভালোবাসি—

—অবসরের চেয়ে মাইনে ভালো লাগে আমার। আপনাকেও সেই রীতিতে দীক্ষিত করতে চাই যদি—

—ওটা কি গৌড়ীয় রীতি?

—না, বিদর্ভ।

—কী কাজ করতে হবে—

—এখন যা করছেন—তা কেমন লাগে?

—মন্দ নয়—

—কিন্তু মাইনে কম।

—কিন্তু এ-কাজে অবসর বেশি। অবসরের মানে কী তা-ই আমি খুঁজছি। সেই জন্যেই অবসর চাই। অবসরের মানে যদি ফাঁকি হয়, তা হ'লে চাইব না।

—কী করা যেতে পারে অবসরে যদি টাকা রোজগার করা না হয়।

শূন্যপ্রয়াণে চলেছে যে-রাজহংসী—খানিকটা শামুক গুগলি ছুঁড়ে ফেলা হ'ল যেন তার সামনের পথে—পীড়িত পাখির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে সেনের কথা ভেবে দেখছিল শম্পা। না, মনে হ'ল না রাজহংসীর : টাকা ছাড়া যে শান্তি নেই, অবসর সৃষ্টিই হতে পারে না, খুব ভালো মাইনে ছাড়া যে সম্মান নেই এবং সব-চেয়ে সান্ত্বনা যে স্বৈরাচারে;—সেখানে তো টাকাই প্রথম কথা, শম্পা তা জানে। হ্যাঁ, টনক আছে বটে সাহেবের কথায়।

কিন্তু তবুও সে বল্লে—আমার জীবন গুছিয়ে নিয়েছি

—কী রকম?.

—এখানে যে-কাজে আমি আছি তার থেকে আমাকে বরখাস্ত না করলে—

সেন আহত হয়ে বল্লেন—না, না, সে-কথাই ওঠে না—

—তাহ'লে—আমি যা পাচ্ছি, মাসে-মাসে তা যদি পাওয়া যায়—তাতেই আমার হয়ে যাবে। 'এক জন মানুষ বেশি কী চায় পৃথিবীতে' কেউ-কেউ ভাবে। কিন্তু আমি তা ভাবি না। আমি অনেক কিছুই চাই। কিন্তু সবই ধীরে-সুস্থে জুটে যায় আমার। কোনও পরিকল্পনা ক'রে চাওয়ার হুড়োহুড়ি নেই আমার—

—ধীরে-সুস্থে জুটে যায়—সবই?

—যা জোটে না তা নিয়ে আফশোষ করবার মতো অত উঁচু তারে বাঁধা মন—শম্পা একটু হেসে বল্লে—না. সে-মন আমার নেই।

—নেই?—সেন উজ্জ্বল বিচক্ষণ ভাবে তাকিয়ে বল্লেন, আপনার বরাত ভালো।

হাসছিলেন সেন।

—ওরা বোম্বে প্ল্যানিং করছে, ওয়ার্ধা স্কিম আছে ওদের। আরও অনেক হেপাজতে পৃথিবীর মানুষ হায়রান হয়ে যাচ্ছে। এটা ভালো। এক দিন শুভ হয়ে যাবে সব। কিন্তু সে-দিন আমাদের প্রায় সকলের জীবনের থেকেই অনেক দূরে—

—সে-জন্য কী করতে হবে?

—যা পাওয়া যায় তা-ই নিতে হবে—

—তা নিচ্ছেন কোথায় আপনি—আমি তো দিতেই চেয়েছিলাম—

—টাইপরাইটার আর শর্টহ্যান্ড-এর গোলকধাঁধা তো বোম্বে প্ল্যানিং-এর ভিতরেই পড়ে—হাসির বিষণ্ণতায় বিমুগ্ধ হয়ে বল্লে শম্পা—যেন বিমর্ষ কাচ ভেঙে পড়ল খানিকটা, খ'সে ছিটকে উড়ে গেল চারদিকে—আমার জীবন আর এক রকম।

—বুঝেছি কোন রকম। কিন্তু সে-জীবনের জন্য তো আরও অনেক বেশি টাকার দরকার। অনেক—অনেক বেশি।

—আমার রোজগারই তো আমার সব নয়।

—বাপের আমলের টাকা ক' দিনের?

—সে-জিনিস নেই আমার।

—নেই? কে দেয় তাহ'লে?

—এ-কথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—জিজ্ঞেস করা অন্যায় আমার। মাথা হেঁট ক'রে স্বাভাবিক আন্তরিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে বল্লেন সেন।

এক জন বেয়ারা এসে একটা ট্রেতে ক'রে স্তূপীকৃত কাগজপত্র রেখে গেল। সে-দিকে লক্ষ না ক'রে সেন বল্লেন—যে-কাজে আপনি আছেন তা-ই যদি আপনি উপভোগ করেন তাহ'লে আমার বলবার কিছু নেই আর। এ-কাজে আস্তে-আস্তে মাইনে বাড়বে—আশা করা যায়—কিন্তু বিস্ময়কর পদোন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই।

—অফিসে মানুষ একটু নিরিবিলিই থাকতে চায়

—'একটু নিরিবিলিই থাকতে চায়' সায় দিয়ে বল্লেন সেন।—কিন্তু আমাদের ফার্মেসি থেকে ম্যালেরিয়ার যে অব্যর্থ ওষুধ বার হবার কথা ছিল—তা কুইনিনের চেয়েও ঢের বেশি মোক্ষম; তার ফর্মুলা খুব সতর্ক ভাবে গোপন ক'রে রাখা হয়েছিল—কিন্তু তা না-কি চুরি গেছে—

—চুরি গেছে? বিমূঢ় ভাবে সেনের দিকে তাকাল শম্পা।—কে চুরি করেছে?

—শুনেছি ফর্মুলা দু' লাখ টাকায় সে বিক্রি করেছে। কী রকম মাথাখারাপ!—দু' কোটি টাকা পেলেও তো আমি ছাড়তাম না।

শম্পা বিবর্ণ মুখে টেলিফোনের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবছিল, কমলাক্ষকে টেলিফোন ক'রে দেবে। তাকে টেলিফোন ক'রে দেবে এই যে—

—কিন্তু কে বিক্রি করেছে—শম্পা জিজ্ঞেস করল।

—বমাল ধরা পড়ে নি তো কেউ। সন্দেহের ব্যাপার। কেউ-কেউ ভাবছে আমিই চুরি করেছি—বিক্রি করেছি।—সেন সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—

শম্পা খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে—আমার কী মনে হয় জানেন?

—বলুন

—এ-রকম কোনও ফর্মুলা তৈরিই হয় নি।

—(তা-ই?) কিন্তু ওরা আমাকে নোটিশ দিয়েছে

—কীসের জন্য?

—সন্দেহ করে ব'লে। আমি এ-অফিস ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

—কবে?

—আজই চ'লে যাব—হয়তো—

—আজ তো মাসের সাতাশ তারিখ—আর তিন দিন—

—না, এ-মাসের মাইনেও নেব না আমি। ওরা আরও ছ' মাসের মাইনে দিতে চেয়েছিল।

ঘরের ভিতর বাতাস খেলা করছিল। মস্ত বড়ো ওয়াল-ক্যালেন্ডারটা ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল, খটখট ক'রে শব্দ হচ্ছিল দেয়ালের ওপর। (দেয়ালে ঘড়ি আবার পনেরো মিনিট পরে সূর্যকিরণের মতো বেজে উঠল যেন; কার যেন অপরূপ সূচিমুখ কিরণের মর্মস্নায়ুকে জাগর ক'রে তোলে পনেরো-পনেরো মিনিট অন্তর।)

—আপনি অনেক দণ্ডশ্রমের এই যে গল্প করলেন, মিস্টার সেন, তার সঙ্গে রোজকার কাজের রুটিনের তো কোনও সম্পর্ক নেই—বল্লে শম্পা—

—না, তা নেই

—এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিস্টার সেন

—হ্যাঁ—কিন্তু অফিস তো ব্যক্তিকে নিয়েই। আপনাকে নিয়ে—আমাকে নিয়ে—নিজের বুকের ওপর আঙুল দিয়ে আঘাত ক'রে বল্লেন সেন।

অগ্রাহ্য ক'রে শম্পা বল্লে—আমাকে হয়তো অফিসের কোনও কাজে ডেকেছিলেন—ভেবেছিলুম—

—না, সে-রকম নিছক কোনও কাজ নেই আজ আর—

—তাহ'লে আমি উঠতে পারি

—বসুন। ওরা আমার নামে (নালিশ) মোকদ্দমা করবে ঠিক করেছে। কিন্তু, সত্যিই এ-রকম কোনও ফর্মুলা তৈরি হয়েছে ব'লে মনে হয় আপনার?

শম্পা কোনও উত্তর দিল না। গভীর লোভ হচ্ছিল তার সমরেশকে টেলিফোন ক'রে দেবার জন্যে। সমরেশকে সে টেলিফোন ক'রে দিত : ফার্মেসির বড়ো সাহেব তার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন যে ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ওষুধ, কুইনিন-এর চেয়েও যা ঢের বেশি মোক্ষম—এমন কোনও ওষুধের ফর্মুলা বাস্তবিকই ফার্মাসি তৈরি করেছিল কি-না।

—চুরি হয়ে গেছে—আমি (না-কি) দু' লাখ টাকায় বিক্রি করেছি—সেন বল্লেন

—আসলে ব্যাপার কী জানেন—

এক জন কেরানি—বড়ো-সড়ো হয়তো—ঘরের ভিতর ঢুকে নানা রকম কাগজপত্র নেড়ে-নেড়ে কয়েকটা ফাইল (বার ক'রে) নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—ওরা কি চুরি প্রমাণ করতে পারবে? শম্পা জিজ্ঞেস করল

—টাকা ছড়ালে সবই পারবে

—আর দু' লাখে আপনি যদি বিক্রি ক'রে থাকেন—চারদিককার খোলা জানালা দরজার দক্ষিণায়নের সূর্যের মিঠে রোদের দিকে পিঠ রেখে খুব খুশি হয়ে হেসে শম্পা বল্লে, তাহ'লে আপনিও ছড়াবেন।

—কে—আমি? তা-ই তো ভাবে ওরা। কিন্তু ওরা আর আপনি তো এক লোক নন!

শম্পার ইচ্ছা হচ্ছিল কমলাক্ষকে টেলিফোন ক'রে জানায় যে ফার্মাসির বড়ো সাহেবের ধারণা জ'ন্মে গেছে যে সেই কারবারের সত্ত্বাধিকারী আর ফার্মাসির চুনোপুঁটি চাকুরে শম্পা চৌধুরী এক লোক নয়; এ-ধারণা তাঁকে একটা স্থিতিসাম্য দিয়েছে। মন স্থির হয়ে আসছে তার; অনুভূতি নানা রকম বিকৃতির পথে ঘুরে আত্মনিবেদনের শান্ত পথ ধ'রে স্বাতীর দিকে ফিরে আসছে—ফিরে আসছে এমনই অপলক ভাবে যে শুক্তির দু'টো ডালা যে খুব জাম হয়ে আছে সে-দিকে নজর নেই। স্বাতীও যে সব সময় শিশির দান করে না তারও কোনও হিসেবনিকেশ নেই; এর থেকে কি কখনও মুক্তোর জন্ম হয়?

—ওরা কিছু প্রমাণ করতে পারবে না

—মোকদ্দমা করবার ইচ্ছে নেই ওদের—বিশুষ্ক ভাবে বল্লেন সেন।

—করে যদি টাকা ঢালতে হবে শুধু—অথচ কিছুই বেরুবে না। বেরুবার মতো নেই তো কিছু।

—আমি জানি—সেন হাত বাড়িয়ে—কী ধরবেন—নিজের হাতটাকে ধ'রে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন।—ওষুধের ঘুণাক্ষরও তৈরি হয় নি। সাপের হাঁচি। ও-সব কোনও কিছু ফর্মুলা ছিল না ওদের। আপনার কী মনে হয়?

বিচলিত ভাবে হেসে শম্পা বলতে গেল—কিন্তু—

দেয়ালের ঘড়িতে অপ্রার্থিত অন্ধকারের কিঙ্কিণী বেজে উঠল আবার শম্পা কিছু বলবার আগে। ওরা দু' জনেই একসঙ্গে তাকিয়ে দেখল ঘড়ির দিকে,—আসলে আমাকে দিয়ে কোনও কাজই হচ্ছে না ওদের। (সেন বল্লেন) কোনও কাজ করবার ইচ্ছাই নেই আমার। এই যে এত ক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করলুম, মিস চৌধুরী, এ কি কাজের নমুনা?

লিখতে-লিখতে সেন আবার বল্লেন—কমলাক্ষ সমরেশ ওদের কাজের পদ্ধতি আমার জানা নেই—

কিছু ক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না শম্পা, কেমন ডাকাবুকো মেয়ের মতো সেনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। নিঃশ্বাস ফিরে পেয়ে অবশেষে—কী ক'রে জানলেন আপনি—কোথায় শুনলেন ওদের কথা?

—আমার এ-কাজ কাজের নমুনা কি না জিজ্ঞেস করেছিলুম? এ যদি কাজ না হয় তাহ'লে কাজ বলে কাকে? একটা ওষুধের মালমশলা পুডিং তৈরি হল, বেটপকা চুরি, দু' লাখ টাকায় বিক্রি, সেন চাকরির থেকে বরখাস্ত

সেন কাজের ভিতর ডুবে গেছেন। শম্পা নেই, শম্পা যে উঠে চ'লে গেছে নিজের ঘরের দিকে নিজের চরকায় তেল মালিশ করতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েই (যেন) লোকটা অমানুষিক ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অফিস ঠেলছে।

—ওঃ, আপনি এখনও আছেন—শম্পার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে সেন বল্লেন।

—আপনি লিখছেন তো খুব—

—ওম্নি গল্পগুজব ক'রে কাটানো; এই আর কী! এই জন্যই আপনাকে টাইপ-মেশিনের বাঁয়াতবলাটা ঠিক ক'রে নিতে বলেছিলুম। সেক্রেটারি ক'রে নিতে পারতুম। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কথাবার্তা বলা হোত—সাত হাত দূর থেকে। আমি ব'সে-থাকা মানুষ, এগিয়ে যেতে পারি না। কমলাক্ষদের বয়স কত?

—চব্বিশ, ছাব্বিশ, তিরিশ

—ওঃ, আর আপনার হয়তো—

—উনিশ

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে সেন বল্লেন—উনিশ? না-না—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আচ্ছা—না-না—উনিশ নয়—ওটা কিছু নয়—ওটা অন্য কথা—আচ্ছা—ওঃ, বেশ, তা-ই হবে

রিসিভারটা রেখে দিয়ে বল্লেন—আমার ছেচল্লিশ।

উঠে দাঁড়িয়ে টুপি এঁটে শম্পার দিকে তাকিয়ে—শম্পা যখন জন্মে নি এই

পৃথিবীতে তখনকার দিনের একটা মৃত হাসি জিইয়ে ভাসিয়ে তুলে—সেন বল্লেন—আচ্ছা, চল্লুম। আবার দেখা হবে।

শম্পার মনে হ'ল তার বাড়ির ঠিকানা সেনকে সে দিলেও দিতে পারত। কিংবা মিস্টার সেনের বাড়ির ঠিকানা কি জেনে নেবে শম্পা? কিন্তু কেউ কাউকে কোনও ঠিকানা-মাফিক মানুষ ব'লে পছন্দ ক'রে নিতে পারল না হয়তো। সেন চ'লে গেলেন।

শম্পা পর দিন এসে শুনল সেনকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—কাজে তিনি খুব বিখ্যাত হ'লেও কাজকর্মে/রুটিনে তাঁর মন ছিল না ব'লে।

—কী চেয়েছিলেন সেন?

—কিছু চেয়েছিলেন—নির্মলা বল্লে।

—কেন চ'লে গেলেন?

—কী মনে হয়—তোমাকে ভালোবেসেছিলেন?

—তা হ'লে তো আমার ঠিকানা জেনে রাখতেন—

—তোমার ঠিকানা নেন নি? নেন নি বুঝি? কিন্তু আমার ঠিকানা তো নিয়েছেন। কোনও দিন এ-অফিসের ছায়া মাড়াবেন না আর ব'লে গেছেন। তোমাকে বলেন নি?

—না।

—তোমার ঠিকানা নিলেন না কেন?

শম্পা কাজে মন দেবে—না হ'লে কী আর করবে সে—কার্ডবোর্ড-এর বাক্স কতগুলো এল? একটা হিসেব নেওয়া দরকার। নির্মলাকে ও বলল—কার্ডবোর্ড বাক্স চৌকো ত্রিশটা এসেছে—

একটা ডেমিঅফিসিয়াল চিঠি লিখতে হবে আমায়, নির্মলা, টিটাগড় পেপার-মিল-এ

—সেনের ঠিকানা এ-অফিসে আছে—বার ক'রে দেব তোমাকে?

শম্পা মুখের দিকে তাকাল নির্মলার—তারপর কানের দিকে—এত বড়ো-বড়ো দু'টো কান? মেয়েমানুষের? নির্মলার মতো আঁটসাঁট সুপুরির মতো মুখের মেয়েমানুষের? কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট ক'রে দিলে হয় না?

—না, ঠিকানার দরকার নেই। শম্পা বল্লে।

নির্মলা চ'লে গেল।

শম্পা ভেবেছিল দু'-চার দিনের মধ্যেই সেন ফিরে আসবেন—অফিসের কাজে না হ'লে শম্পাকে দেখতে—অফিসে না হ'লে শম্পার নিজের বাড়িতে। কিন্তু অনেক দিন কেটে গেল—তবুও কোথাও দেখা গেল না সেনকে। এই বারে ঠিকানার দরকার। কিন্তু নির্মলাকে না জানিয়ে নিজেই সে ঠিকানা বার করবার চেষ্টা করল। কিন্তু অফিসের কোনও চিত্রগুপ্তই সেনের ঠিকানা কোনও দিকের কোনও ফাইলেই খুঁজে পেল না।

—সেনের ঠিকানা নেই, মিস চৌধুরী

—কিন্তু তিনি তো এখানে কাজ করতেন।

—সে অনেক আগের কথা। সে-সব খাতা বাতিল হয়ে গেছে।

—পুরোনো খাতা পুড়িয়ে ফেলা হয়!

—না, মিস চৌধুরী, এটা তো খাতার অফিস নয়, ওষুধ-বিষুদের কারখানা। খাতায় ছাতকুড়ো প'ড়ে গেলে সে-সব আমরা ডেড লেটার অফিসে পাঠিয়ে দিই।

শম্পা হায়রানের একশেষ হয়ে অবশেষে নির্মলাকে লাগিয়ে দিল—কিন্তু সেনের ঠিকানা কোনও কেরানির জিম্মার থেকেই খুঁজে বার করতে পারল না নির্মলা।

ফার্মাসির প্রোপ্রাইটর শম্পাকে ডাকলেন এক দিন।

—আপনি সেন সাহেবের ঠিকানা চাচ্ছেন?

—হ্যাঁ

—কেন?

—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?

—অফিসে এসে?

—না, আপনার বাড়িতে গিয়ে।

—আমার ঠিকানা তো জানেন না তিনি।

—বাঃ হা! প্রোপ্রাইটর হেসে ফেলে বল্লেন—আমাদের অফিসের ফাইলে আপনার ঠিকানা অজানা নয় তো। তিনি এসে চাইলেই আমরা দিয়ে দিতে পারি।

শম্পা প্রোপ্রাইটরের মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল আগাগোড়া জিনিসটা।

—আমি যা বলেছি বুঝেছেন, মিস চৌধুরী?

শম্পা বাকযন্ত্রে বাষ্প চলাচল করছে টের পেয়ে ঠোঁটে হেসে—দাঁতে হেসে উঠল—নিঃশব্দে—কিন্তু খুব ভালো লাগল প্রোপ্রাইটরের। ভালো যে লেগেছে প্রোপ্রাইটরের মুখের দিকে না তাকিয়েও আঁচ ক'রে নিল শম্পা—ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে তার; প্রোপ্রাইটরের ঘরটাও চতুর্থ বিস্তারের নিরুপমতায় বেশ নির্জন।

—আপনার একটা চিঠি আছে।

—কে লিখেছে?

—লিখেছি আমি—প্রোপ্রাইটর বল্লেন।

—আপনি? আমাকে?

—হ্যাঁ। সেনের ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারি—কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার চাকরি আমি নিয়ে নেব। লেনদেন না হ'লে কারবার চলে কী ক'রে, শম্পা দেবী।

শম্পা অনেক দিনের একটা চেনা বাঁক পিছে ফেলে আর এক পথ ধ'রে এগিয়ে আসছিল ; খারাপ লাগছিল না তার। গালে হাত দিয়ে কালো কালির মতো চোখের অসাধারণ মনোনিবেশে দেখছিল শুনছিল মানুষটার সুন্দর না হোক — বেশ সুসম্পন্ন ফিটফাট কাবড়াই মুখের দিকে তাকিয়ে।

—ঠিকানা না চাইলে আমি আপনাকে আমার সেক্রেটারি ক'রে নিতে পারি।

—সেক্রেটারি

—হ্যাঁ

—কী করতে হবে?

—কিচ্ছু না। মাইনে আড়াই শো।

—কিছুই করতে হবে না? শম্পা বিপদ মেনে হেসে বল্লে।

—মাঝে-মাঝে টেলিফোন ধরতে হবে। কে কী বলে জানাতে হবে আমাকে।

—এ ছাড়া?

—না। আর কিছু না।

—কিন্তু আমি তো হিন্দি-উর্দু তেমন জানি না—; ইংরেজি-কেমিস্ট্রির; —সায়েবরা বল্লে—

বাধা দিয়ে প্রোপ্রাইটর বল্লেন—না, না, বাংলায় যারা টেলিফোন করবে—ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নয়—এম্নি—সেগুলো—সেগুলো—সেগুলো ধরতে হবে শুধু।

—তা-ই বলুন, ভাদুড়ী সাহেব—শম্পা বল্লে সাহসিকার মতো। ভালো লাগল ভাদুড়ীর ; ভালো যে লেগেছে টের পেল শম্পা।

—কিন্তু তবুও হিন্দি উর্দু ইংরেজি এ-সবও বেশ রপ্ত ক'রে নেওয়া চাই। আমি সব টেলিফোনই ধরব, ভাদুড়ী সাহেব—

—ও, আপনি বুঝি আমাদের সব ঘাঁতঘোঁত জেনে ফেলতে চান। অপরিহার্য হয়ে উঠতে চান। বাঃ বাঃ এই রকমই তো চাই আমি—ডোরাকাটা সোনালি বাঘের মতো হুমকি দিয়ে হেসে বল্লেন প্রোপ্রাইটর। বাঘের মাসির মতো অতল নিঃসঙ্গতায় হাসছিল শম্পা প্রোপ্রাইটরের মুখের দিকে তাকিয়ে। অতলতম নিঃশব্দতায়। ধীরে-ধীরে বাঘিনির মতো দেখাতে লাগল শম্পাকে। চাঁদের রুপালি নদীর পারে মেহগিনির বনে। বাঘিনি টের পেয়েছে একটা এঁড়ে বাঘকে হটিয়ে দিয়ে রায়বাঘের মতো তার মুখোমুখি ব'সে আছে প্রোপ্রাইটর। কী বেকুব, সেনের ঠিকানা চেয়েছিল সে ; শম্পা মাথা হেঁট ক'রে হাসতে লাগল।

—কাঁদছেন আপনি?

—আমি হাসছিলাম

—কিন্তু চোখে জল যে আপনার

—না তো—শম্পা রুমাল দিয়ে চোখ না মুছে ভিতরের রক্তের টানে চোখের জলটাকে শুষে নেবার চেষ্টা করল।

—সে এক রকম হাসি আছে যাতে চোখে জল এসে পড়ে—প্রোপ্রাইটর খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন।

—তা পড়ে আমি জানি। কোনও কাজ করব না, আড়াই শো টাকা পাব—এ-আনন্দে আমার চোখের জল পড়বে না, ভাদুড়ী সাহেব?

প্রোপ্রাইটর একটু ভেবে বল্লেন—আপনাকে আমাদের আর এক ডিপার্টমেন্টে অনন্তশয়নমের সেক্রেটারি ক'রে দেব। মাসে পাঁচ শো টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেব—

শম্পা অরুচি জানিয়ে বল্লে—না, আমি এইখানেই থাকব।

কী বেকুব আমি, শম্পা পীড়িত হয়ে ভাবছিল, কেন চোখে জল এসেছিল আমার। কিন্তু মেয়েমানুষের হৃদয় কুমোরের কাদা দিয়ে তৈরি, ছিঃ। চোখে জল এসে পড়ল আবার শম্পার ; কিন্তু এ-বার অন্য কারণে—ভাদুড়ীর ছোঁয়াচে এসে হৃদয় তার সত্যিই বিচলিত হয়েছে ব'লে। ভাদুড়ীর মতন এ-রকম আশ্চর্য মানুষ কোনও দিন দেখে নি সে।

জীবনে এত দিন পরে—অবশেষে—এই বার—সব-চেয়ে কঠিন কারণে চোখে জল এসেছে শম্পার। এ-বারও ভিতরের রক্তের টানে চোখের জল ধীরে-ধীরে শুকিয়ে নিল শম্পা ; খুব লাভ হ'ল তার—পুরুষকে চিনল, মেয়েমানুষকে চিনল—কোনও স্খলন-পতন হবে না আর। এই একুশ বছর বয়সেই পৃথিবীকে দেখে শিখে ফেলতে পেরেছে শম্পা।

—আমার এখানেই থাকবেন?

—হ্যাঁ। থাকব।

—থাকুন। কিন্তু অনন্তশয়নমের ওখানে গেলে কাজ বেশি শিখতে পারতেন আপনি। আমি—আমি প্রায়ই তো অফিসে আসি না।

—কেন?

শম্পা ভাদুড়ী সাহেবের নাক চোখ কপালের মণ্ডিত বেশ খানিকটা দিকপালের মতো চেহারার দিকে তাকিয়ে বল্লে। —আপনি না এলে আপনার চেয়ারে বসব আমি?

ভাদুড়ী নিরেট চোখে শম্পার দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর স্ল্যাকসের পকেটে দু' হাত ডুবিয়ে হেসে বল্লেন, এখুনি বলা যায় না কিছু। আমাকে সময় দিন। সময় দিন।

—সময় তো সামনেই প'ড়ে আছে—পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও।

টেলিফোন অনেক ক্ষণ ধ'রে বেজে যাচ্ছে—ভাদুড়ী সাহেবকে সেটা মনে করিয়ে দেবার ফাঁকে-ফাঁকে হাসতে-হাসতে বল্লে শম্পা।

রচনাকাল : আগস্ট ১৯৪৬। কলকাতা

এই লেখাটি জীবনানন্দ কিছু-কিছু পরিমার্জনা করেছিলেন। শিরোনাম জীবনানন্দ-নির্ধারিত নয়; এই গল্পের শেষের দিকের একটি পংক্তির অংশ-বিশেষ বাছাই ক'রে নিয়ে শিরোনাম রচিত হল।

হেমন্তের দিনগুলো

হেমন্তের দিনগুলো কলকাতায় কেটে যাচ্ছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—এখন যুদ্ধের পরের পৃথিবী। প্রকাণ্ড উৎকণ্ঠার পর এসেছে তত বড়ো অবচনীয় অবসাদ;—উৎকণ্ঠা তো রয়েই গেছে। অসিত মাঝে-মাঝে স্বীকার করতে ভুলে যায় যে তার জীবনের অবসাদ বাইরের (কোনও) পটভূমির সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু তা কি সম্ভব : নিজের মনোপৃথিবীতে সমান্তরাল শাসন কি কেউ চালাতে পারে যা ব্যবহারিক পৃথিবীকে চেনে, কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

দক্ষিণ কলকাতায়—লেক বাজারের থেকে বেশি দূরে নয়—একটা নতুন দেড়-তলা বাড়িতে সম্প্রতি রয়েছে অসিত, তার স্ত্রী সীতা ও তাদের একটি (মাত্র) ছেলে—এ-বাড়িটা তার নিজের নয়, তার আত্মীয় রমেশের। রমেশ প্রায়ই কলকাতার বাইরেই থাকে—কলকাতায় বাড়িটা কাউকে ভাড়া দেওয়া পছন্দ ক'রে না সে, আগে ভাড়া দিত, আগের ভাড়াটেরা বড়ো গোলমাল করত; এক সময় এক থাইসিস রুগীও এ-বাড়িতে ছিল; এ-বাড়ির শেষ ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিতে ঢের বেগ পেতে হয়েছে রমেশের, মোকদ্দমা পুলিশকোর্ট আলিপুরকোর্ট এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টেও চালাবার কথা ছিল। অত মোকদ্দমা বরদাস্ত না করতে পেরে ভাড়াটে নিজেই স'রে গেছে। রমেশের নিজের দোষ ছিল বৈ-কি—যখনই সে কলকাতায় ফিরত তখনই ভাড়াটেদের উঠে যাবার নোটিশ দিত, ঘরদোর কমবেশি মেরামত করা বা হোয়াইটওয়াশ করার ভার যে কার ওপরে এ নিয়ে তার অতিরিক্ত চুলচেরা তর্কের ধোঁয়া ফুলকি ষোলো চোঙা ঝেড়ে বেরুতে থাকত। ইলেকট্রিক পাম্পের মেইন সুইচ তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে জলের বরাদ্দ তার নিজের মর্জি অনুসারে নিয়মিত করত, কখনও-বা একেবারেই বন্ধ ক'রে দিত; মেজাজ বেশি খারাপ হলে পাম্পটাকে কেটে ফেলবার সঙ্কল্পও করত।...ভাড়াটে সব তাড়িয়ে দিল সে। বাড়ি ভালো ক'রে মেরামত ও চুনকাম ক'রে অসিতের হাতে ছেড়ে দিল। ভাড়া লাগবে না। তবে অসিতদা যেন ছোট ভাড়াটে না বসায়—দু'-চারটে ঘর খালি প'ড়ে থাকলেও।

রমেশ কলকাতার বাইরে চ'লে গেল—চার-পাঁচ বছরের ভিতর ফিরে আসা

অসম্ভব জানিয়ে দিয়ে।

যুদ্ধের শেষের দিকে এ-সব ঘটনা ঘটেছিল। অসিত মফস্বলে কাজ করত। দু'-তিন বছর আগে এক বার কলকাতায় সে এসেছিল সপরিবারে—বেড়োতে ঠিক নয়, চাকরি বা ব্যবসা করতেও নয়—কিন্তু, কেমন একটা অদ্ভুত প্রাণসরিৎসাগরের উচ্ছলতা অনুভব ক'রে—কলকাতা-জীবনের গতি বিরতি ও ভাবপ্রতিভায় নিজেকে মথিত ক'রে নেবার একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব ক'রে।

মফস্বলের চাকরিতে অসিত জমাতে পারে নি কিছু—দেনা হয়েছিল। এ-বার—মাস ছ'-সাত আগে—কলকাতায় এসে সে প্রথমে অন্য কারু গলগ্রহ হয়ে কাটাচ্ছিল—সুবিধা পাচ্ছিল না—মফস্বলেই ফিরে যেতে হবে ভেবে নিরাশ হয়ে পড়েছিল—এমন সময় শুনতে পেল রমেশের বাড়িটা খালি প'ড়ে আছে। রমেশের কাছে প্রস্তাব করতেই বাড়িটা পাওয়া গেল। তারপর এই কয়েক মাস ধ'রে রমেশের বাড়িতে সে আছে। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সব টাকাই প্রায় খরচ হয়ে গেছে অসিতের। প্রথম ছ' মাস পুরো মাইনেতে ছুটি পেয়েছিল—তারপর মাইনে অর্ধেক ও সিকি হয়ে গেল-—এখন সে মাইনে পায় না আর। মফস্বলের অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছে যে বিনে বেতনেও তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে না। সে ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দিতে চায় কি না আগামী মাসের পনেরোর ভিতরেই জানাতে হবে।

আজ সকাল বেলা অসিত লেকের পাড়ে বেড়োতে গিয়েছিল। কী চমৎকার জল—পাড়াগাঁর জলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বটে—কিন্তু তবুও এর মহিমা আলাদা, ও-দিক দিয়ে বালিগঞ্জের ট্রেন ধোঁয়া উড়িয়ে গর্জন ক'রে চ'লে যাচ্ছে। গোটা বড়ো পৃথিবীটা কাছেই। অবিশ্রান্ত মোটরের হর্ন সেই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে। পেট্রলের গন্ধের ভিতর তারই মহিমা। তবু দু'টো কাক মেহগিনির মতো কালো ডানা মেলে জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে—ওদের প্রতিফলন জলের ভিতরে। সাদা বক জলেরই পাখি—ঘন গাছগুলোকে ধূসরিত ক'রে উড়ে যাচ্ছে। সে পাখি নয়—অনাদির বিস্ময়কর প্রেতাত্মা—সূর্যের বর্ণালিতে উদ্ভাসিত হয়ে কী গভীর করুণানিঃসৃত এই পাখি মানুষকে আলো দেখিয়ে তবুও মানবতার অহেতুক অন্ধকারের কাছে বার-বার চাপা প'ড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

উপরে একটা গাংচিল উড়ছে—না তাকিয়েও অনুভব করা যায়—তাকাতে গেলে জানা যায় সূর্যোৎসারিত পৃথিবী সময়ের হিসেব শেষ ক'রে অসিতকে দান ক'রেছে সুখদুঃখের স্বত্বশূন্য সময়ঘড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ—...মেঘে বাতাসে মর্মরিত আনন্দসূর্য। সময়ের কোনও হিসেব নেই এখন আর। গোছানো নির্জন পথ। পথের দু' ধারের ঝোপের বেড়া। বড়ো উঁচু গাছ চোখে পড়ে। সৈন্যরা, সৈন্যনারীরা কোথায় চ'লে গেছে আজ; সাহস, প্রাণ ও রিরংসার অবসানে মিলিটারি ব্যারাকের টালি ও অ্যাসবেসটস চালার দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে; জল ওখানে নেই—এখানে আছে। কিন্তু, তবুও, জল ওখানে নেই—এখানে আছে—এ-কথা বলতে পারে

না আসত।

প্রকৃতি ও নগরীর চোখের পাপড়ি যেন সব; তাদের চোখের তারা জলের মতন। কালো জল—সূর্যনাশন জল—সূর্যমর্মরিত জল—ওই দিকে জলশিশুদের বীথি—ঘাসেদের। এ-দিকে এসে জল উড়ুক্কু পাখিদের, উড়ন্ত রৌদ্রের।

তবুঁও ডুবে মরেছে যারা, যারা না ভালোবেসে মরেছে, নগরীর থেকে অনেক দূরে ইতিহাসের কালো সময় কেটেছে যাদের ভালোবাসাকে চিনে অথচ গ্রহণ করবার পথ (না) খুঁজে না পেয়ে—অসিত একটু বিমর্ষ হেসে ভাবল জীবন যাদের কাছে ত্রৈলোক্য মুখুজ্যের কঙ্কাবতীর গল্প কিংবা জীবন যাদের কাছে অন্নের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু কিম্বা ঘেটোর ইহুদিদের মতো অথবা কোলাহলের নারী ও শিশুশাবকদের মতো অথবা অন্ন ঠকিয়েছে, ছেনেছে, ছিঁড়েছে শকুনের মতো ধারাল কত ১৩৫০-এর তারিখ, উড়িয়ে নিয়ে গেছে পৃথিবীর পথে-পথে—জল, সহজ তরঙ্গের সরল নির্দোষ অন্তর্জলি। এই বিরাট নগরীর পটভূমি আশ্রয় ক'রে হ্রদ এখানে অশান্ত নয়—শান্ত নয়—সহজ কঠিন দক্ষিণ—ভোরের অন্তহীন—অবর্ণনীয় জলের বেবিলন, লণ্ডন, চুঙকিঙ, কলকাতা, ক্রেমলিন কাকলীর ভিতর।

বাড়িতে ফিরে এসে অসিত একটা চিঠি পেল—মফস্বলের অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসেছে। লিখেছে ছুটি তার সাত মাস হয়ে গিয়েছে প্রায়। এ-রকম একটানা ছুটি এত ব্যস্ত কাজকর্মের দিনে কাউকে তারা দিতে পারে না—পনেরো বছর ধ'রে অসিত যে তাদের অফিসে ভালো কাজ ক'রেছে সে-কথা অস্বীকার করবার মতন আবশ্যকতা তাদের নেই—তারা তার চাকরির সুখ্যাতি স্বীকার ক'রেছে—সত্যিই অসিত তাদের অফিসের মর্যাদা বাড়িয়েছে। তাকে বরখাস্ত করবার কথা তারা ভাবতে পারে না। এ-জিনিস মনে রেখেছে ব'লেই অফিসের নিয়ম শিথিল ক'রে অসিতকে এত দিন ছুটি দিয়েছে তারা।—

প'ড়ে অসিতের আত্মমান আত্মমূল্য চেতনার বেশ খুশি হয়ে উঠবার কথা ছিল, কিন্তু সে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

চিঠির নীচের দিকে আরও কিছু লেখা আছে—তা-ও আবার জায়গায়-জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগানো। আপাততঃ সে-দিকে তাকাতে সে দ্বিধা বোধ করছিল। চিঠিটা মুড়ে খামের ভিতর রেখে দিয়ে সে স্থির করল আজই একটা কিছু উত্তর পাঠানো দরকার—অবিশ্যি সমস্ত চিঠিটা সম্পূর্ণ ভাবে পড়বার পর। পড়া তো (সাঙ্গ) হয় নি এখনও—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ওপরের থেকে সীতা নেমে এসে বল্ল, তোমার একটা চিঠি আছে।

লোক্যাল?

না, ডাকের চিঠি—মফস্বল থেকে এসেছে—টেবিলের ওপরেই ছিল—পেয়েছ

নিশ্চয়—

ওঃ—সেটা— অসিত ক্ষ্যামা খেসারত দেবার মতো ভঙ্গিতে বল্লে, ওটা কিছু নয়—বোধ হয় রামচরণ লিখেছে—

—চিঠি খোলা হয় নি এখনও—

—রামচরণের হাতের লেখাই মনে হল। ভালো কথা—ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। রামচরণ চাকর ভালো—সাত মাস ধ'রে ওকে মাইনে পাঠাচ্ছি—কিন্তু—

সীতা একটা জলচকির উপর ব'সে বল্লে—রামচরণকে হাতছাড়া করা অসম্ভব। ও রকম চাকর কপালে মেলে—কারু-কারু তিন পুরুষের ভাগ্য আছে—যেমন খোকনের আছে—তোমার বাবার ছিল—কাজেই ও-সব চাকর তিন পুরুষ আগলে থাকে। না—না— বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে তড়াসে ঘুড়ির মতো মাথা নেড়ে সীতা বল্লে—দেখছ-না কলকাতায় চাকর নিয়ে কী ঝামেলা—এমন লোক দেখলুম না যে পনেরো/কুড়ি টাকাও কবুল করছে কিন্তু পাচ্ছ না মনের মতো চাকর। রামচরণ যা চায় তাকে তাই-ই দিয়ে দিও। মদনগঞ্জে ফিরতে হবে তো আবার আমাদের। তখন রামচরণকে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে যে। কী চেয়েছে ও? লিখেছে কী!

—ঠিক কথা, সীতা। ওর মতন চাকর আর নেই।—

(চুপ ক'রে গেল অসিত।)

চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে নিয়ে অসিত বল্লে—ও-রকম ধরনের চাকর সব টস্‌কে যাচ্ছে পৃথিবীর থেকে—এটা শ্রেণী কাটাকাটির যুগ কি-না। বিপ্লবের দিন এগিয়ে আসছে—রামচরণ কোন্ ছার—অনেক চেনাজানা শৌখিনতাই ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।

—যে কোনও কথা বলতে গেলেই কী যে ওই এক দ্যাকড়ার তোমার। বল্লে সীতা—রামচরণ তো বিপ্লবী নয়।

—তা নয়। কিন্তু ওর নির্বুদ্ধিতা যে ভাঙিয়ে খাওয়া উচিত নয়—নিজেকে শুধরে নিয়ে অসিত বল্লে—উচিত হবে না, যখন বিপ্লব আসবে—মানে ইশারা ক'রে জানিয়ে দেবে যে সে সত্যিই আসছে।

এর আগে, অসিত বল্লে, ওকে ঠকিয়ে ভাঁড়িয়ে যাওয়া চলে। বিবেকের দংশন খেয়ে। এ-বিষয়ে যে আমরা একা নই, সব শয়তানদের সাগরেদ, এই কথা মনে রেখে রামচরণের সেবা আমরা ভোগ করব, সীতা।

অসিতের এ-তত্ত্ব—স্থূল নয় ঠিক—সীতা অন্য জিনিস ভাবছিল ব'লে—সূক্ষ্ম নয় ঠিক—ধোঁয়ার মতন মনে হচ্ছিল তার।

অসিতের শেষ কথাটা অন্যমনস্কতা ভেঙে ফেলবার মতো। শুনে সীতা বল্লে—হ্যাঁ, ভোগ করব বৈ-কি—কবে যাচ্ছ মদনগঞ্জ?

—যাব এক দিন।

—চলো তবে পরশুই।

—এতটা তাড়াহুড়ো তোমার শরীরে সইবে না, সীতা। তা ছাড়া সেখানে তো টিনের ঘরে গিয়ে থাকতে হবে। এখানে প্রাসাদে রয়েছ—লেক আছে—লেকের বাজারও।

সীতা বিরক্ত হয়ে বল্লে—ভাঁড়ামির বেশ একটা হৃদয়গ্রাহিতা আছে বটে, কিন্তু ধর্মের ষাঁড় যখন ফক্কুড়ি করে—

—তখন গা জ্ব'লে যায়, না সীতা? কলকাতাই আসল কথা নয়, মদনগঞ্জও নয়; টাকার গরমেই সীতা পাতাল প্রবেশ ক'রে—না হ'লে বনবাসে যায়—এই তো আজ পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের মনের কথা। মাস তো ফুরিয়ে এল—কত টাকা আছে আর?

সীতা দাঁতে দাঁত ঘষছিল।

অসিত মুখ তুলে বল্লে—কেন, কথা বলি বুঝি নচ্ছারের মতো—এই সীতার সঙ্গে সেই সীতার তুলনা দেয়? উপমা ভুল করি। সময় সমাজ যুগের হিসাব খেয়াল থাকে না।

খুবই শান্ত নম্র নির্দোষ ভাবে বল্লে অসিত।

দাঁতে দাঁত ঘষা ঢিলে হয়ে আসছিল সীতার। কিন্তু—মনের ভিতর হিংসার ভাষা ছটফট করছিল—অতি কষ্টে নিজেকে নিরস্ত ক'রে রাখছিল সে। না হ'লে অসিতকে এত ক্ষণে কিছুটা পশুস্পর্শের পরিচয় পেতে হত—পশুর মতন তার কানের মাংসে।

অসিত চুপ ক'রে গেল।

সীতাও নিভে আসছিল। সে বল্লে—রামচরণ কলকাতায় আসে না কেন

—ও আসবে না।

—ব'সে-ব'সেই ওখানে মাইনে খাবে?

—তা-ই তো মতলব দেখছি। চালও রেখে এসেছি দশ মণ—

—ও তো ভয়ঙ্কর পাঁজি পুরুৎ মানে, লিখে দাও-না স্বপ্ন দেখেছি—কালীঘাটের দেবী ওর কাছ থেকে মানত চেয়েছেন এইখানে—তাঁর নিজের এলেকার ভিতরে—ওর উত্তর পেলেই ভাড়ার টাকাটা পাঠিয়ে দেবে।

অসিত আড়ামোড়া ভেঙে বল্লে—এ-সব ফাঁদে ধরা পড়বার ছেলে রামচরণ নয়, তা ছাড়া মিথ্যে কথা কেন লিখতে যাব?

—উঠি এখন—বল্লে সীতা।

কিন্তু ব'সে রইল।

অসিতের মনে হ'ল সীতার দু'-পাটি দাঁত কথা ভাবছে। এ-রকম অস্বাভাবিক ভাবনার অভিব্যক্তিতে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ক'রে। এক মুহূর্ত আগেই সীতার অনুরোধেও রামচরণকে মিথ্যা কথা লিখবার মানুষ সে ছিল না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই মনের ভিতরে মিথ্যা সাজিয়ে নিয়ে সীতাকে (প্রবোধ দেবার জন্য) তার সুন্দর দু'-পাটি দাঁতের দিকে তাকিয়ে অসিত বল্লে—আমার হাতে ভালো চাকর আছে—থাকে

গড়িয়াহাটা—আজ পারবে না—পরশু পেরিয়ে—তরশু—তার আসবার কথা। তাকে আগাম কিছু দিয়ে বুক ক'রে এসেছি, সীতা, (আমি)।

—কত টাকা দিয়েছ?

—সাত টাকা, মাইনে হবে পনেরো টাকা

—এত টাকা কোথায় পাবে তুমি?

অসিত একটু হেঁচে কেশে হাঁচল আবার। বল্লে, সত্য ঘটনা হচ্ছে, তোমার পাঁচ-পাঁচটা ঝি পালিয়ে গেছে, মোদ্দা কথা আমাদের চাক'রের দরকার—স্ত্রীলোক না হয়ে পুরুষ হ'লেই ভালো হয়—এবং সৎ পুরুষ হ'লে আরও ভালো—সে-রকম পুরুষমানুষ আমি পেয়েছি—তাকে যে পনেরোটা টাকা দিতে হবে ওটা অপ্রাসঙ্গিক।

সীতা তার স্বামীকে না চেনে যে তা নয়, তবুও মোটামুটি তৃপ্ত হল।

বল্লে—একটা কথা শোন বলি।

—বল।

—রামচরণকে আর টাকা পাঠাতে পারবে না ব'লে দিলাম।

অসিত হাঁচি ঝেড়ে নাক মুখ লাল ক'রে বল্লে—সে হয় না, সীতা। সে কী কখনও হয়। সে আমার বাপের কালের চাকর।

—কিন্তু কিছুতেই সে কলকাতায় আসবে না? আমরা লোকের অভাবে ম'রে হেজে গেলেও সে মুখ তুলে তাকাবে না? এটা নিদেন অন্যায় নয় কি,—এখানে শ্রেণীর রেষারেষির কোনও কথাই উঠতে পারে না।

অসিতের হঠাৎ সর্দি লেগেছে, ভারি গলায় বল্লে—সে যা খুশি হোক্, চাকর তো তোমাকে দিচ্ছিই।

সীতার চোখের ভিতর থেকে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে গেল—বল্লে—আগে আসুক। দেখি কেমন আসে। কলকাতায় এসে এই সাত মাসে তুমি অনেক খেলো হয়ে গেছ। (তোমার) কথা মানে কথার খেলাপ

—আসবে। আসবে।

সীতা উঠে দাঁড়াল।—আজ বেলা তিনটের আগে ভাত পাবে না।

—তা হোক্; চান ক'রে আসছি—আমি তোমাকে সাহায্য করব।

—না, সে-সবের দরকার নেই। গায়ের চামড়া একটু দূরে থাকলেই আমার ভালো লাগে। সীতা চ'লে যাচ্ছিল—দু'-এক পা গিয়ে ফিরে এসে বল্লে—বাকি এক শো টাকা দিয়ে দাও।

—কীসের টাকা?

—দাঁড়াতে পারছি না—সীতা বল্লে, খোকনকে এখুনি পাঠাতে হবে রেশনের জিনিস আনতে।

—কেন, এ-মাসের গোড়ার দিকে দু'শো টাকা দেই নি তোমাকে

—দু'শো টাকায় তিন জনের সংসার চলে? চক্ষুষ্মান উচ্ছলতায় অসিতের মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে বল্লে সে।

সেই উচ্ছ্বলতার আবহাওয়ার ধ্বকের ভিতরে—গনগনে আঁচের ভেতরেই যেন একটা সিগারেট জ্বেলে নিয়ে অসিত বল্লে—আমাদের খাওয়াদাওয়া তো তেমন কিছু আর নয়—বাড়িভাড়া লাগে না—স্টাইল নেই—

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অসিত কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে বল্লে—সিগারেটটা বাতাসে নিভে গেল। জ্বালাই আবার। জ্বালানো দেশলাইকাঠিটার দিকে তাকিয়ে বল্লে—ও এক শো টাকার ব্যাপার তোমাকে বিকেলেই মিটিয়ে দেব। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখছি।

কাঠিটা নিভে গেল।

দেরাজ খুলে কতগুলো জাপানী নোট পাওয়া গেল—পাশের বাড়ির রসিক মিত্তিরের ছেলে পোর্ট ব্লেয়ারের থেকে নিয়ে এসেছে। পনেরো শো টাকার জাপানী নোট এক টাকায় বিক্রি ক'রেছিল সে অসিতের কাছে।

'এ-সব নোট দিয়ে খোকনকে বুঝ দেওয়া চলে—খোকনের মাকে নয়—' নিঃসহায় উৎসাহে এক-আধ মুহূর্ত ভাবল অসিত।

বল্লে—বেভুল মন আমার—দেরাজে নেই তো—রয়েছে ক্যালকাটা কমার্শিয়ালে—দুপুরে ওঠাব—বিকেলে পাবে।

সীতা চ'লে গেলে অসিত বাইরের দেয়ালে চিঠির বাক্সটা ভালো ক'রে হাতড়ে দেখল। একটা পোস্টকার্ড যেন কাঠের সঙ্গে পালিশ হয়ে মিশে আছে। (কত দিন প'ড়ে আছে কে জানে?) সুখবর নিশ্চয়ই নয়। বুক পকেট থেকে চশমা বার ক'রে দু'-এক লাইন প'ড়েই কার্ডটা সরিয়ে রাখল অসিত;—রামচরণ লিখেছে : তিন মাসের মাইনে বাকি তার, অবিলম্বেই যেন মনিঅর্ডার ক'রে টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম তিন-চার মাস তো বাবু কলের মতন নিয়মে মাসের প্রথমেই টাকা পাঠিয়েছেন—এখন এ-রকম করছেন কেন—

একটা পোস্টকার্ডে গুঁড়ি-গুঁড়ি অক্ষরের অজস্র সর্ষে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ লম্বা ফট্টাই ইস্তাহার।

সিগারেট জ্বালাল অসিত। ভাত খেতে তিনটে বেজে যাবে ব'লে গেছে সীতা। পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ পাত হয়তো পড়তে পারে। খোকন কোথায়? সিগারেটে এক টান দিয়ে অসিত ভাবল—ঠিক এ-রকম জীবন আমি চালাতে চেয়েছিলুম কি-না? সীতার মধ্যে জিনিস ছিল—কিন্তু এই যে তার শরীর আমার মনের ভেতর কোনও ভাবই জাগায় না, এক-আধ মুহূর্তের স্বভাব ছাড়া, এই যে তার মন আমাকে নাড়া দিতে পারে না আর চুম্বক হারিয়ে গেছে ব'লে—এর জন্য সবটা দায় আমার নয় বটে, কিন্তু তবুও—আমিই দায়ী। ওর আরও ভালো—মন্দ—বিয়ে হতে পারত কি-না সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। কিন্তু যা হয়েছে, সেটাকে আমি সফল ক'রে তুলতে পারি নি। উদ্যম হয়তো

আমার চেয়ে বেশি ছিল তার, কিন্তু তবুও সীতাও পারে নি। এ-রকম জীবন আমি চাই নি।

এ-জীবনে বহুতা সৌন্দর্যকে ভালোবেসেছি প্রকৃতির—নারীর—মননের—এবং স্থিরতাকেও। সেটাকে সৌন্দর্য ঠিক বলে না; বলা চলে চেতনা অভিনিবেশের; এ আমারও আছে, আমি যাকে চাই তারও আছে; পরস্পরকে এক জন ক'রে নেওয়া চাই। কিন্তু তবুও তো প্রকৃতিকে ভালো ক'রে কাছে পেলাম না টাকা নেই ব'লে। এ-কথা উনবিংশ শতাব্দীর। বিশ্বাস করত? কিন্তু আমার জীবনে—আজকের আমাদের সকলেরই জীবনে—এই অবস্থায় পড়লে এই শতকে পূর্বজ মনীষীদের জীবনেও প্রকৃতি অর্থবশ্যতা স্বীকার করত না কি? আজ পৃথিবীর সর্বমানবের সংকট যে অসচ্ছলতার অবধূতরাষ্ট্রে, তার থেকে প্রকৃতি স'রে যাচ্ছে; নারী নেই, ভাবনার উদারতা নেই, চিন্তার সঙ্গতি নেই—

এই হেমন্ত কাল আমি ভালোবাসি। কত পাড়াগাঁয়ের হেমন্ত মনে পড়ছে আমার। অঘ্রাণের বিকেল বেলা—নদীর নিঝুম জল—মাঠে খড় প'ড়ে রয়েছে—বাঁয়ে তাকালে অনেক নৌকোর কমলা ধূসর ফিকে-নীল ফিকে-সবুজ পালে রোদ এসে পড়েছে দেখা যায়—রোদের ভিতর সাদা পালের অপরিসীম উজ্জ্বলতা মানুষের নয়—হৈমন্তী সূর্যের : মাঝিদের ভিড়—এখানে সেখানে—বিকেল যেন ঘরানা প্রেতের মতো, পেয়ে গেছে নিঃশব্দ নিঃস্পৃহ মানবীর মাপ—হেমন্তের মাঠে বাজারে। আবার নদীর জল—আবার খড়ের মাঠ—বাছুরের সোনালি পশম খড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে—চারিদিকে কৃষক—গোরুর কজ্জলশ্রী ভেদ ক'রে এক মাধ্বী সাদা গাভী পূর্ণিমার মতো—আকাশে হরিয়াল—উঁচু আকাশে রোদের ফাঁদের ভিতর চাতকের ডানা খেলা করছে—কয়েকটা চাতকের—সব সময়ই তাদের বিমুক্তি ধরা গেছে জেনে—নিকোনো রোদকে ধ'রে রাখতে চেয়ে—রোদকে নিভে যেতে দিয়ে—

হেমন্তে নারীর দেখা পেয়েছি কি কোনও দিন?

পেয়েছি। কিন্তু যে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম, অথচ হেমন্তলোক তাকে কোথায় রেখে দিয়েছে? কোথাও রেখে দিয়েছে এই উপলব্ধি ছেদ ক'রে ফেলে তবু হেমন্তের জল—বিকেল—ও আকাশের নীচে চলতি পথের প্রতিভা নষ্ট হতে দেয় নি। আজও চলছি তো তাই—অথচ কেউ নেই—কিছুই নেই—মানুষও অধঃপতিত—হেমন্তের বিবৃতি বেঁচে রয়েছে শুধু—বিবেক জেগে আছে; আজ সকালে ধাকুরিয়ার লেক যা বলেছে এখন দুপুরে অন্বিষ্ট মানুষের উৎসাহ নিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে বুঝে মানবীর মতো। কিন্তু দুপুর—শূন্য লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক-মিছিলের জিনিস তো তা।

নির্জনের ভিতর ব'সে রইল সে।

গভীর রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে অসিত ভাবছিল : রামচরণকে টাকা পাঠানো চাই।

তিন মাসের মাইনের জন্য ত্রিশ টাকা। সীতার সঙ্গে আমার যে মিথ্যা সনাতনী খেলা চলেছে এটা আজকের পৃথিবীরই ধূমায়িত কালিমা—না কি সময়েরই নিজের কথাই এই?

রামচরণের ব্যাপারটা চাপা দিয়েছি তার কাছে, অফিসের চিঠি চাপা দিয়েছি। কিন্তু তাকে যে ভালোবাসি না সেটাও এত অতলে চাপা দেওয়া জিনিস যে চেপেছি ব'লেই মনে ভাবতে পারছি না। আমার সম্পর্কে তার তো ঠিক দায়ধারাও এম্নি পরিষ্কার—স্বাভাবিক।

সীতাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি—সে-ও আমাকে; কিন্তু তারপর এখনকার এই সমাজসংস্থানের তাড়াতমসায় কোথায় দাঁড়াব গিয়ে আমরা। ওদের লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে দাঁড়ানোও যায়। কিন্তু জন্তুর যা ছিল না—মানুষ তা ফুটিয়ে তুলেছে—উত্তরমানুষ তাকেই অতিক্রম করবে হয়তো। কিন্তু এখনও তো আমরা সূত্রপাতের মানুষ মাত্র। সীতার প্রতি যে করুণাবোধের বিলাসিতা সাংসারিক দায়িত্ব কালের কাছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজ প্রতি মুহূর্তে—সেই দায়িত্ব স'রে গেলে করুণা তার মৃত মসৃণ মুখোশ খুলে ফেলবে না কি?

ফেলবেই তো।

দুপুর বেলা অসিত—নিজে টের পেল না—কিন্তু ট্রাম বাস লরির গর্জনের থেকে অপর কী এক মনোনিবেশের প্রসাদে মুক্তি পেয়েছিল। সে যে ভাবছে টের না পেয়ে ভাবতে লাগল : দেহে ম'রে যাবার অনেক পথ আছে—মনে ম'রে যাওয়ার আরও ঢের বেশি। কিন্তু তবুও—আশ্চর্য—সীতাও কী ক'রে বেঁচে থাকাই সঙ্গত মনে করে?

দু' দিক দিয়েই অজস্র মৃত্যু প্রবেশ করেছে ওর সত্তার ভিতর। তবুও কি-না আগুনে পুড়ে এখন রাঁধছে। কেন? ওর দেহ খাবে। সন্ধ্যাবেলা খোঁপা ভেঙে—চান ক'রে—মাথার অজস্র চুল বুনে ফেলবে দু'টো বিনুনির শিঙের ভিতর—যাবে লেকের ধারে বেড়াতে খোকনকে নিয়ে।

কেন?

প্রতিদিনের তিমির মৃত্যুকে পরিষ্কার ক'রে নেয়া চাই—বুঝে নেয়া চাই যে জীবন রয়েছে। খরখরে শুকনো পাতার মতন সারা দিন রৌদ্রে ধুলোয় উড়ে—অবশেষে শাখা থেকে খ'সে ছিঁড়ে জলের (বুকের) ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া চাই—বিমুক্তি আছে যে তা জানার জন্য, নিজেকে পরিচ্ছন্ন ক'রে নেবার জন্য জলের ভিতর দিয়ে—নিরবচ্ছিন্ন জলস্রাবের উপর দিয়ে—উড়ে গিয়ে—হেমন্তের জলের।

রামচরণকে চিঠি লিখতে বসল অসিত।

লেখা শেষ হ'লে অফিসের চিঠিটা প'ড়ে শেষ করল। লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে-কেটে ওরা জানিয়েছে মেডিকেল প্রয়োজনে অসিত যে আরও দু' মাস ছুটি চেয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে—সে-সার্টিফিকেট নিরেস কি না সে-প্রশ্ন না তুলেও ওরা সে-রকম ছুটি বিনে-বেতনে দিতেও রাজি নয়। পনেরো দিনের মধ্যে কাজে

ফিরে না এলে ওরা নতুন লোক রাখবে ঠিক করেছে।

ও-কাজে সে আর ফিরতে পারবে না এই মর্মে চিঠি দাখিল ক'রে দিল অসিত। কোনও ব্যাঙ্কে বা কোথাও তার টাকা মজুদ নেই অবিশ্যি, কিন্তু তবুও দুপুর মাথায় ক'রে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে টাকা যোগাড় করবার জন্য।

অসিত টাকা পেল না কোথাও—প্রতিশ্রুতি এক-আধটা না পেয়েছে যে তা নয়। কিন্তু তা তেমনই প্রতিশ্রুতি। ও-জিনিস এ-বয়সে চিবিয়ে খাওয়া চলে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের অবশিষ্ট দেড় শো টাকা ছিল—সামনের মাসে এই টাকা দিয়ে নিজের হাতে সংসার চালিয়ে দেখবে ভেবেছিল সে। এক মাস সময়ের ভিতর যা-হোক একটা চাকরির ব্যবস্থা ক'রে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু এক শো টাকা সীতাকে দিতে হবে—ত্রিশ টাকা রামচরণকে। রামচরণকেই দেওয়া দরকার—তার জাৎবিবেক এই কথাই বলে। অথচ সীতাকেই দিতে হবে—অসমর্থ স্বামীর অবচেতনা তাকে অস্বস্তিকর ভাবে বুঝিয়ে যায়।

দেরাজ খুলে দেখা গেল—পনেরো শো টাকার জাপানী নোট। এ-সব নিয়ে কাউকেই ভাঁওতা দেওয়া যায় না খোকনকে ছাড়া! জাপানীরা যদি কলকাতায় চ'লে আসত তাহ'লে অবিশ্যি এ-নোট অসিত পেত না। এ-সব রসিক মিত্তিরের ছেলেরাই পায়—জাপানীরা এলেও, না এলেও।

মিলিটারি কন্‌ট্রাক্‌ট্ নিয়ে—কালোবাজার ক'রে ছেলেটা কত জায়গায় ঘুরেছে—কত লাখ টাকা ক'রেছে—কত মেয়ে চষেছে, নিজেই অসিতের কাছে সে-সব গল্প অনেক বার ক'রে গেছে সে। অসিতের হাতে যখন টাকা ছিল মনোহরকে প্রশ্রয় দিত না সে—বলত, আমি দরকারি বই পড়ছি বা লিখছি—তুমি খোকনের সঙ্গে গল্প কর গিয়ে, মনোহর। মনোহর খিড়কির পথ দিয়ে না ঢুকে সদর দরজা দিয়েই সীতার কাছে যাওয়াটা সমীচীন মনে ক'রেছিল; সীতার কাছে চ'লে যেত সে। এই এম্নি যাওয়া—আসা-যাওয়া—গল্প করা—সব জায়গায়ই (যে) সব জিনিসই যে নানা ছেদ-অনুচ্ছেদের ভিতর দিয়ে একই মর্মে—মর্মস্নায়ুতে ফিরে আসে এ-কথা মনে করত না মনোহর। মনে করতে ভালো লাগত না তার। সীতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল অপর রকম ভালো লাগার। আস্বাদ নেবার—ভালো লাগার শক্তির পরিধি অবিশ্যি বড়ো ছিল না তার, লীলায়িত ছিল না; ঘুরে-ফিরে চিনির দানার পিঁপড়ের ব্রহ্মদর্শনের মতন সীতার আবহের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকত সে।

মনোহর বোধ হয় শেয়ার-মার্কেট থেকে ফিরেছে, খোকন? অসিত জিজ্ঞেস করল।

—জানি না। দেখে আসব?

—হ্যাঁ

—ডেকে আনব?

—ডেকে আনবি? ক'টা বেজেছে?

—ছটা বেজে গেছে। পেলে ডেকে আনব মন্টুদাকে?

অসিত শেলফের থেকে একটা মোটা বই বের ক'রে নিয়ে ইজিচেয়ারে ব'সে বল্লে—না, ডাকিস নে—এম্নি দেখে আয় আছে কি না

খোকন চ'লে যাচ্ছিল। অসিত বল্লে—আচ্ছা, বল গিয়ে যে আমি ডাকছি।

সিল্কের শার্ট সিল্ক-ট্রাউজারের পকেটে দু'-হাত চালিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে মনোহর বল্লে—কী খবর। বৌদির কিছু হয় নি তো।

—না। কী হবে।

ঘরে কয়েকটা চেয়ার থাকতেও মনোহর একটা টেবিলের কিনারে এঁটে ব'সে বল্লে—ছেলেটা একটা ক্যাবলা—আপনার ছেলেটা।

—কেন, কী ক'রেছে

—করবে আবার কী। উদোর মতন হঠাৎ কোত্থেকে এল দেখলুম, বল্লে, আমাদের বাড়িতে ডাকছে আপনাকে। তাকিয়ে দেখি ওঃ চোখ টসটস করছে। ওই তো ভ্যা-ভ্যা ক'রে কাঁদছে—

—কাঁদছে? কেন, কী হয়েছে? অসিত কান পাতল, সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, কোনও কান্নার শব্দ কানে এল না তার।

—কী—হয়েছে কী, মনোহর। অজিত করেছে কী।

—কী করেছে আর কী করে নি তা আমি জানি না। শেয়ার-মার্কেটে আজ জান কবুল হয়েছে। সে চুলোয় যাক—মেজাজ আমার তিরিক্ষে হয়ে ছিল ব'লেই নয়—এম্নিই ওকে ক'ষে জমিয়ে দিলুম—দু' ঘুসো—

অসিত একটু দাঁতে হেসে বল্লে—আমিই ওকে পাঠিয়েছিলুম

—না, সে-জন্য নয়, অসিতদা—এক শো বার আমাদের বাড়িতে যাক্, কিন্তু ছেলেটা ও-রকম নোনছা বোষ্টম কেন। কথা বলতে গেলে চোখে জল। আহা, কী-ই যে তৈরি করেছেন ওকে!

মনোহরের গলায় কফ আটকে গিয়েছিল। টেনে নিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে এক দলা কফ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে—আজকালকার পৃথিবীতে ও-সব ছেলে দিয়ে কিস্‌সু হয় না।

'হয় কী না হয় অসিত নিজে তার প্রমাণ নয়। অসিত নিজে ক্যাবলা ছিল না, কিন্তু কিছু হ'ল না তার। পৃথিবী ক্রমাগত বদলাচ্ছে। টাকার দিক দিয়ে এখন মনোহরের মতন ছেলেদের জন্য স্বর্ণযুগ এসেছে। আবারও বদলাবে পৃথিবী। তখন বেঁচে থাকলে অসিত বা তার ছেলের অন্য রূপ জীবনচেতনার একটা মোটা মূল্য থাকবে হয়তো।' বুঝিয়ে বলতে চাইল মনোহরকে। কিন্তু তত্ত্বকথার চেয়ে দরকারি কথা ভালো।

—তোমাকে একটা কাজে ডেকেছি, মনোহর। বল্লে অসিত।

মনোহর কলকাতার পথঘাটের সে এক রকম সেয়ানা ধাড়ির মতো হেসে বল্লে—কী কাজ আমি বুঝেছি।

—না, সে তুমি জান না, বলি নি কোনও দিন তোমাকে।

মনোহর হাতে তালি দিয়ে বল্লে—কী ক্যাবলা—বলার দরকার হয় না-কি, অসিতদা। আমি দেখেছি যে বৌদির ক'-দিন থেকেই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

শুনে বিস্মিত হ'লেও বিমূঢ় হ'ল না অসিত। এ-সব ছেলেদের সঙ্গে সে কিছু দিন থেকে কথা ব'লে অভ্যস্ত হয়ে আসছে।

মনোহর বল্লে—আমার উপরই ভার দিয়ে দিন।

—হ্যাঁ, তোমার উপরেই ভার। আমাকে দু' হাজার টাকা দিতে হবে।

মনোহর হেড়ে গলায় হেসে বল্লে—না, না, অত লাগবে না। কোনও পুরুষ ডাক্তার ডাকবেন না। আমার চেনা খুব ভালো লেডি-ডাক্তার আছে—নাম আছে। মিলিটারি—

অসিত হেসে বল্লে—ওটা তোমার ভুল, মনোহর; বৌদির কিছু হয় নি, দু' হাজার টাকা আমি নিজের জন্য চাচ্ছি।

মনোহর ভুরু কুঁচকে চুপ থেকে কী যেন ভাবছিল। অসিত ভাবল টাকাটা দেবে কি না—কত দিতে পারবে হিসেব করছে হয়তো। কিন্তু অসিত যে টাকা চেয়েছে মনোহর হয়তো সেটা শোনেই নি; অন্য আর-এক রকম চিন্তার খেপলা জাল গুটিয়ে ঝেড়ে চোখ চেয়ে মনোহর বল্লে—ভুল আমি করি নি। আমার কাছে জিনিসটা চাপতে চাইছেন আপনি।

—কোন্ জিনিস? অসিত (কিছুটা বিরক্ত হ'লেও) বিস্মিতের ভান ক'রে বল্ল।

—বৌদির কথা বলছি আমি

—কী হয়েছে তার?

—লেডি-ডাক্তারের কথা তার জন্যেই তো বলেছিলুম

—কেন, লেডি-ডাক্তার কী হবে

মনোহর একটা সিগারেট বের ক'রে বল্লে—এ-বাড়িতে কোনও মেয়ে নেই। বৌদি পুরুষ-মহলে থাকতে ভালোবাসে; আপনি মেয়েঘেঁষা পুরুষমানুষ নন; কোনও মেয়েকেই কি প্রত্যাশা করতে পারেন, অসিতবাবু, যে আপনার সংসারের মেয়েলি ব্যাপারে এসে আপনাকে সাহায্য করবে। আমাকে আপনার ছোট ভাইয়ের মতন মনে ক'রে নিতে পারেন না কি আপনি।

অসিতের মনে হ'ল ছেলেটা আজ মদ খেয়ে এসেছে। কিংবা কী জানি মদ হয়তো খায় নি সে। কিন্তু কী বলতে চায় ছেলেটা।

—তা যদি না পারেন তবে গুণময়ীকে ডেকে দেব

—গুণময়ী কে?

—আমার দিদি

—দিদি; তোমার আপন বোন?

মনোহর মাথা নেড়ে বল্লে—না, খুড়োর মেয়ে; আপন খুড়ো; আমাদের বাড়িতেই থাকে গুণময়ী—বিধবা, বত্রিশ বছর বয়স—কিন্তু দেখায় আঠারো-উনিশের মতো

এমন প্রজ্বলন্ত সুন্দরী—

মনোহর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল। অসিতও জ্বালিয়ে নিল একটা।

মনোহর ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে—সে চুলোয় যাক্, কিন্তু—মনোহর টেবিলের থেকে একটা লাল মলাটের বই তুলে নিয়ে তার ওপর সিগারেট-সমেত ডান হাতের মুঠো দিয়ে আস্তে-আস্তে তাল ঠুকতে-ঠুকতে বল্লে—যে-কারণে গুণময়ীর উল্লেখ ক'রেছিলুম আপনার কাছে তা হচ্ছে এই যে বৌদির এই ব্যাপারে—তাকে দিয়ে আপনার খুব সাহায্য হবে।

শুনে অসিত নিজের সিগারেটে মন দিল।

মনোহর বল্লে—জিনিসটা আগাগোড়া মিনিকচ্ছপের পেটে সেঁধিয়ে রাখতে চান যখন আপনি তখন গুণময়ীকে দিয়েই আপনার কাজ হাসিল হবে।

তা ছাড়া—নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে-করতে মনোহর বল্লে—গুণময়ী খুব ভালো ধরতে পারে।

"'ধরতে পারে' ওটা হল পারিবারিক প্রয়োগ—না স্ল্যাঙ্?—অনেক দিন শুনি নি" অসিত ভাবছিল। মনোহরের দিকে তাকিয়ে বল্লে—সে হবে। গুণময়ীকে ডাকা হবে। সবই হবে। কিন্তু সম্প্রতি আমাকে দু' হাজার টাকা দিতে হবে তোমায়।

সিগারেটটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ট্রাউজারের ভিতর সবেগে দু' হাত ঢুকিয়ে ফেলে ঘাড়ে-গর্দানে দোর্দণ্ড সুখ-সুবিধা-বলাধান জাঁকিয়ে তুলে মনোহর বল্লে—দু' হাজার টাকা—দু' লাখ টাকা দিয়ে প্যাঁদাতে পারি সীতাসাবিত্রীর স্বামীদের—কিন্তু কেন—কেন—দিতে হবে কেন? কোনও ক্ষতিপূরণের কথা ভাবছেন আপনি।

—না, ক্ষতিপূরণ আর কীসের—

বাধা দিয়ে মনোহর বল্লে—যেমন ধরুন যখন ভেসেলিন দেবার দরকার থাকে না আর, মানে বুড়িয়ে গেছে বড়ো, এর ওর স্ত্রীকে এর ওর স্বামী খেসারত দেয়। কিংবা দু' জনেই যখন স্বামী তখন গোস্বামীকে ভূস্বামীর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

যেন খানিকটা আবর্জনা গিলে ফেলে অসিত বল্লে—না, না, কোনও ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না; আমি ধার চাচ্ছি।

শুনে মনোহর একটা ভারি বাঁদরলরি মজার কথাই শুনেছে বুঝতে পেরে অসিতকে বল্লে—ব্যবসা চলে ব্যাঙ্ক-এর ওভারড্রাফট-এ? ব্যবসা করবেন তো? সেই ক্যাপিটেল নিয়ে ব্যবসা করবার—এটা তো ক্যাশ নয় যে ধার দেওয়া-থোওয়ার গুখ্খুরি। মাইফেলি।—এক পয়সাও সঙ্গে নিতে হবে না আপনাকে। চলুন আমার সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে—বিনে-টাকায় টাকা পাইয়ে দেব। কথায়-কথায় সব হয়ে যাবে। ছালা বার করবার দরকার হবে না। আমায় দেখুন, সব টাকা কথায় কন্ট্রাক্টে ঘুরছে—ক্যাশে দানা বাঁধতে দিয়েছি কী মরেছি। আমি কী ক'রে ক্যাশ দেব আপনাকে। তবে বাবার কাছে চেয়ে দেখতে পারেন। আমরা হলাম পথ—ঘাটের—আর উনি হলেন দাখিলা পরচা বন্ধকি তমসুকের--

মনোহর চ'লে যেতে-যেতে বল্লে—উনি হলেন সৎ শ্রী ভারতীয় খাসমহলের ঘুঘু।

রামচরণকে টাকা পাঠাল না অসিত। সীতাকে এক শো টাকা দিলে।

বল্লে—মনোহর তোমার এখানে আসে?

—আসে মাঝে-মাঝে

—কী বলে?

সীতা নোটের তাড়া গুনে নিতে-নিতে বল্লে—আমি কি মনে ক'রে রেখেছি।

—ওর কথা ভুলে যাবার মতন নয়!

—কী রকম?

—ও-রকম ধরনের কথাবার্তায় আমরা অভ্যস্ত নই তো।

—আমার টাকা পেলেই হ'ল—

—তার মানে? অসিতের নাক মুখের চামড়ায় সাঁ ক'রে চোখা-চোখা ভাঁজ প'ড়ে গেল।

সীতা একটু থতিয়ে বল্লে—এই যে তুমি এক শো টাকা দিলে—

—হ্যাঁ, দিলুম—কিন্তু তার সঙ্গে আমি যা বলছিলাম সে-কথার সম্পর্ক কোথায়?

—তুমি কী বলছিলে খেয়াল করি নি—

—মনোহর মাসে-মাসে তোমাকে টাকা দেয়?

সীতা আবছা অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে একটা টেবিল হাতড়ে ধ'রে তাতে ভর দিয়ে বল্লে—মাঝে-মাঝে আমি চেয়ে নেই

—ওর কাছ থেকে?

ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলে গায়ে আঁচলের বাতাস লাগিয়ে সীতা বল্লে—আমি শোধ ক'রে দেব।

—কোথায় পাবে তুমি?

—মনোহর বলেছে আজকাল সিনেমায় ভদ্রঘরের মেয়েদের দাবি চড়া দামে মেটানো হয়—

সীতা তার কথাটা শেষ না করতেই অসিত বল্লে—"ভদ্রঘরের মেয়েদের দাবি চড়া দামে মেটানো হয়" এ-ভাষা তুমি কোথায় শিখেছ, সীতা?

সীতা তার সুন্দর সুস্থ দাঁত বের ক'রে নিজের কথার পথে অগ্রসর হয়ে বল্লে—আমি ভেবে দেখেছি; চেহারা আমার মন্দ নয়,ভালো বলতে পারি। অনেক প্রোপ্রাইটার, প্রোডিউসার, ডিরেক্টরের সঙ্গে মনোহরের আলাপ—এক জন প্রোপ্রাইটার আসতেও না-কি রাজি হয়েছিল আমাদের বাড়িতে—কাল সন্ধ্যা নাগাদ।

—কীসের জন্য?

—কনে-দেখা-আলোয় কীসের জন্য আসে মানুষ?

চায়ের ব্যবসায় নানা রকম চা আস্বাদ ক'রে ঠিক করা হয় কোনটা কী রকম। এক

জন মানুষেরই মুখ ও কণ্ঠ যদিও সীতার,—তবুও এরই ভিতর নানা রকম বৈষম্য ধরা পড়ছিল। হিসেব ক'রে নিতে-নিতে অসিত বল্লে—তা এল না কেন?

—মনোহর বল্লে আমাকে না-কি আজকাল একটু মোটা দেখাচ্ছে—

তাই তো—এই তো এক্ষুনি এই সব বলছিল মনোহর, অসিতের মনে পড়ল।

সীতার দিকে তাকিয়ে সে বল্লে—আজ কী বল্লে মনোহর? বল্লে হয়তো, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে—এটা ওদের পছন্দ হবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি কী ক'রে জানলে।

—চর্বি গালিয়ে একটু রোগা হ'লে ডিরেকটর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। —এই তো আমার ধারণা

—কার—মনোহরের ধারণা?

—না—না—আমার—অসিত ডান হাতের তিনটে আঙুল দিয়ে নিজের বুক চিহ্নিত ক'রে চেপে ধ'রে বল্লে—আমার—আমার—অসিতের।

সীতা খুশি হয়ে বল্লে—তা হ'লে এতে তোমার সমর্থন রয়েছে?

—আমি তোমাকে রোগা বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমি কি মোটা? মনোহর তোমাকে মোটা বল্লে কেন?—আপাদমস্তক সীতার দিকে—শুধু স্বামীর নয়—ব্যবসায়িকতার কেন্দ্র থেকে তাকিয়ে দর্শকদের চাহিদা মিটিয়ে লেহন ক'রে দেখে নিয়ে অসিত বল্লে—এর চেয়ে খারাপ চেহারা সিনেমায় সুনাম কিনেছে ঢের—তুমি তো সুন্দর।

—সে-কথা আমি ওদের মুখে শুনতে চাই—তার পাপড়ির মতো সাদা সাজানো দাঁত বের ক'রে বিষণ্ণ ভাবে বল্লে সীতা : আমি আরও রোগা হতে চাই। পায়ে হুঁচোট খেয়ে আমার একটা হাড় নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো—সেটা ঠিক ক'রে দাও।

—তোমার চলতে কষ্ট হয় কি?

—ব্যথা লাগে

—এম্নি কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে—চলতে গেলে? মনোহর বলছিল তুমি খুঁড়িয়ে হাঁট—কিন্তু আমার চোখে তো তা পড়ে নি। এই তো বেশ হাঁটছ—কোনও আফশোষ খুঁত নেই তো—

সীতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে বল্লে—সব ভেঙে যাচ্ছে—মনে হয়। কী রকম বেগ পেতে হচ্ছে ধারণা করতে পারবে না তুমি।

—কিন্তু সিনেমায় কত ক্ষণই-বা হাঁটতে হবে—কতটুকুই-বা জায়গা—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তো প্রায় কথা বলা।

—আমার বড়ো কষ্ট হয় পায়ে, এক জন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিলে ভালো হয়। পা আমার মচ্‌কে গিয়েছিল মনোহরকে ঠেকাতে গিয়ে—আমার মনে হচ্ছিল ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি। কিন্তু পা পিছলে প'ড়ে পায়ে চোট লাগার পর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বল্লে ওটা ওর মুদ্রাদোষ, দোষটা ওরই ও স্বীকার করলে, কিন্তু

এত বেশি ভয় পাওয়াটা মেয়েদের স্বভাব নয়—বলছিল আমাকে।

স্থির হয়ে শুনে ঘাড় হেঁট ক'রে পায়চারি করতে-করতে অসিত মুখ বেঁকিয়ে সুইচটা টিপে দিল। সমস্ত ঘর আলোয় ভ'রে গেলে অসিত বল্লে—পঞ্চানন চাটুয্যেকে দেখাব। আমার দু'-এক জন চেনা-শোনা লোক আছে—সিনেমার বড়োদের কাছে যারা মুরুব্বির মতো। তারা বল্লে সিনেমার বড়োবাবুরা এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। না কি ওদের ওখানে যাবে। মনোহর নয়, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব তা হ'লে।

কিন্তু জলঝঙ্কারের ব্রহ্মস্বাদ কুয়াশায়—নীরবতায় ফুরিয়ে গেল সব। সহজ সাংসারিক চেতনায় ফিরে আসতেই অসিত শুনল সীতা তাকে বলছে

—সিনেমায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে স্বামীর স্বত্ব হাতে রেখে তুমি যে কারচুপি করবে সে একেবারেই সম্ভব হবে না ব'লে দিচ্ছি তোমাকে। হতে দেব না আমি। ও নামিয়ে দেওয়া মানে নামিয়ে দেওয়া।

অসিত সেই মিলিয়ে যাওয়া জলের রোলকে আবার ফিরে পাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে অবশেষে কয়েক মুহূর্ত পরে বল্লে :

—ক'রে যেতে হবে তো। আমি এত দিন করেছি—এই বার তুমি কর। তুমি নিজেই যাও। এ ছাড়া আর কী চায় মানুষ মানুষের কাছ থেকে এই আকাশ-জল-নক্ষত্রের আশ্চর্য পৃথিবীতে—

কিন্তু লোকটার এই অস্বাভাবিক উক্তি'র কোনও মানে হয় না—এই স্বাভাবিক, কর্ম্মমুখর, স্থিতিসংস্থানের পৃথিবীতে।

সিনেমায় নামার প্রধান বাধা হল সীতা নিজে। অসিত কোনও চাকরি পেল না—দেনা জুটল কম—রমেশের অনুমতি নেওয়া দূরে থাক, তাকে না জানিয়ে বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে হেমন্তের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিল খেয়ে— না খেয়ে—

সীতা মারা গেল তিন মাসে মেয়ে প্রসব ক'রে—খোকন মারা গেল পাঁচ দিনের জ্বরে। এক অন্ধকার রাতে লেকের জলে পা ডুবিয়ে ব'সে ছিল অসিত—নক্ষত্রের আলোয় ডানে বাঁয়ে কাছে অতি দূরে জলের ব্রহ্মস্পর্শে তার মৃত্যু হ'ল না। কেমন একটা সমাধির ভিতর অস্পষ্ট হয়ে পড়ল সে। অনেক রাতে চাঁদ উঠতে দেখে সেই স্বর্গীয় খোকন-পাখি, সীতা-পক্ষিণী, রামচরণ-গিরেবাজটাকে ভালো লাগল তার—জলের না কি বিম্বাঘাসের মঞ্জরীকে বাতাসের আঘাতের মতো ঝঙ্কার চারি দিকে—কিন্তু তবুও গভীরতর পরিচ্ছন্নতায়—শ্বাস রোধ হয়ে যায় মধ্যহ্রদের জলের ভিতর। বুঝতে পারল না সে ডাঙায় রয়েছে—না জলের ভিতরে?—ওই যে আর ক'টি লোক চাঁদের আলোয় ফিরছে ওরা কি জলের অন্তেবাসী—না মাটির পৃথিবীর জিনিস—চাঁদ চারদিককার ধূ-ধূ জলে নেমে এসেছে—এখানে-ওখানে এই-ওই ধূসর জলের সীতা—ফিকে জলের অজিত—কালো জলের রামচরণ। এমন কেন কালো জলের ভিতর এখনও রামচরণ? সবই সবুজ জল হয়ে গেল তাই—স্ফটিকের জলের মতন হয়ে

গেল। অসিত টের পেল হ্রদের পাড়ে সে ব'সে আছে—চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে তার চোখের উপরে। সে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে বল্লে—আশ্চর্য, রামচরণকেও দেখলাম। অজিতকে, সীতাকে। তীর ঘিরে জল টলটলে ডুব জল ঝর্ণার উড়ো জলের ভিতর সংসারের সফেন ভাত স্বাদু মমতার গন্ধ খুব ভালো ক'রে ফুটে উঠল। আহা, ঘাস, জল, সৃষ্টির অন্তহীন সময়—তোমাদের ছকের ভিতর আমাকে টেনে নিয়েছিলে। কোথাও রয়েছে সীতা—আমারই মতন কথা বলছে। না কি, আমার কথা তার কথারই প্রতিধ্বনি : নিরবচ্ছিন্ন সময়ের দিকে তাকিয়ে? কোথাও রয়েছে অজিত রামচরণ—কথা বলছে আজ রাতে—এখনই তাদের কথা আমার কথারই প্রতিধ্বনি : সময়ের অনিঃশেষ প্রবহমানতার ভিতর তবুও নাড়ির যোগ অক্ষুণ্ন রেখে—হাঁটতে-হাঁটতে সে ভাবতে লাগল—ও-পৃথিবী সকলের জন্য নয়—আমার জন্যও নয় হয়তো। এ-সব ভুলে যেতে হবে—ছেড়ে দিতে হবে—যেতে হবে আমাকে কালোবাজার আর সাদা ইয়ার্কির মেরুনা রঙের দেশে।

কিন্তু সে-পৃথিবীতে অসিত মানিয়ে নিতে পারল না নিজেকে—কোনও দিক দিয়েই শেষ রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একটা চাকরি পেল—তিন শো টাকাই দিত—কিন্তু পঁচাত্তর টাকা দেওয়া হ'ল। চাকরিটা নিল সে; কাজ করতে লাগল। যেন ভুল হয় নি, পাপ হয় নি, কোথাও কোনও ছেদ অবচ্ছেদ খণ্ডিত করে নি তাকে। অসিতের এই ভাবটা রপ্ত হয়েছে দেখে এক জন আলাপী জুটে গেল তার। (রমেশের বাড়ির) ভাড়াটেদের একটি বাজে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসিতের বেশ জ'মে উঠল। সুযোগ পেলেই বিধবাটি অসিতের কাছে আসত। এ কোনও মিলন নয়—সঙ্গম নয়—আলাপ-পরিচয়ও নয়।

অদ্ভুত এই খেলা—এর কোনও বিষময় পরিণতিও নেই।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৪৮
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত

হুমায়ুন প্লেসের থেকে

অনেক রাতে হুমায়ুন প্লেসের থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে দাঁড়াল সোমনাথ। এত রাত অব্দি কোথায় সে ছিল—কোথায় ঘুরেছে—কী করেছে—নিজেরই ভালো ক'রে কিছু খেয়াল ছিল না তার।

শেষ ট্রাম চ'লে গিয়েছে। একটা বাস নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছিল—ওটা ধরবার কোনও আশা নেই। একটা ট্যাক্সি করবে কী-না ভাবছিল সোমনাথ। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল বাসটা হঠাৎ গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে খানিকটা সামনেই আস্তে থেমে পড়ছে। একেবারে থেমে গেল বাসটা। এক ভিড় খাকি প্যান্ট কোর্তার মূর্তি না নামতে-নামতেই সোমনাথ সামনের সীট দখল ক'রে ব'সে পড়ল। সে যখন তার আস্তানায় পৌঁছল তখন রাত একটা বেজে গেছে প্রায়। বাসের থেকে নেমে অনেকখানি হাঁটতে হয়েছে তার। নীচের তলার ভাড়াটেরা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। দোতলায় তারই কক্ষে (কক্ষ তার একটা মাত্রই, বেশ বড়ো অবিশ্যি; তেরপলের পার্টিশন দিয়ে দু'টো ঘর ক'রে নেওয়া হয়েছে। একটা শোবার—আর-একটা বসবার—কাজ করবার। দু'টো ঘরেই চেয়ার টেবিল ও টেবল-ল্যাম্প আছে।) আলো জ্বলছে—মনে হ'ল তার। হয়তো সে বের হবার সময় নিজেই আলো জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল—যত দূর মনে পড়ে দরজায় কুলুপ এঁটে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তবুও আলো নিভিয়ে বার হয়েছিল ব'লেই তো মনে পড়ে। দরজা কি খোলা রেখে গিয়েছিল?

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সোমনাথ ভাবছিল ঘরে চোর ঢুকে জিনিষ নিয়ে পালায় নি তো। ঘরে অনেকগুলো বই আছে তার। দরকারি কাগজপত্র আছে কিছু। পোশাক-পরিচ্ছদ—ঘড়ি—সোনা—ক্যাশ রয়েছে বটে এ-দিক সে-দিকে ছড়ানো। খোলা দেরাজে একটা এক হাজার টাকার চেক সাইন ক'রে সে রেখে গিয়েছিল—কালকেই ভাঙাবার দরকার ব'লে। সবই যদি কেউ এসে নিয়ে যায় ক্ষতি নেই তার। কিন্তু তার নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি কিছু আছে। সে-সব সরিয়ে নিলে সোমনাথকে বাস্তবিকই দু'-দশ বছরের মতন—হয়তো সারা জীবনের জন্যই—কানা ক'রে দেওয়া হবে।

নীচের ভাড়াটেরা দুর্দান্ত রকমের অসভ্য। এত রাতে কড়া নাড়লে সোডার বোতল

ছুঁড়ে মারবে তাকে। চেঁচিয়ে ডাকলে দোতলার কেউ সাড়া দেবে না। দোতলার ফ্ল্যাটে অন্য সব কামরায় যে-পরিবারগুলো (কিংবা একটা পরিবার কি?) থাকে তাদের কারুর সঙ্গেই বিশেষ আলাপ পরিচয় নেই তার। সোমনাথের নিজের ঘরটা রাস্তার ওপরেই। নীচের তলার ওই ওয়াটার-পাইপটা বেয়ে-বেয়ে সে ওপরে উঠতে পারে বটে—তারপর একটু কসরৎ; বারান্দার রেলিং ধরতে হবে—ওই মাধবীলতার ঝাড়টাকে খানিকটা পিষে ফেলতে হবে—এদিকে-ওদিকে এক-আধটা ফুলের টব ছিটকে পড়তে পারে—গায়ে কাদা লাগবে তার নিশ্চয়ই—দামি ট্রাউজার ও পপলিনের শার্ট ছিঁড়েও যেতে পারে—দড়াম ক'রে দু'-একটা টব নীচের তলার উঠোনটাকে করবে চূর্ণ-বিচূর্ণ—

কিন্তু তবুও পাইপ বেয়ে-বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। নীচের তলার কেউ তাকে দেখে ফেল্লে সোডার বোতলগুলো রুখে আসবে বুলেটের মতো—চিৎকারে ফায়ার ব্রিগেডের লোক ছুটে আসবে—সমস্ত প্রকাণ্ড বাড়িটা দিকে-দিকে দপদপ ক'রে বিদ্যুতের আলোয় জ্ব'লে উঠবে।

কিন্তু সে পৌঁছে গেছে প্রায়। বারান্দার রেলিং ধরল ব'লে। লতাগাছের শক্ত জটা আঁকড়ে ধ'রে অজস্র লতা পাতা ফুল ও বৃষ্টির জল (ঘণ্টাখানেক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এ-পাড়ায়) বিধ্বস্ত ক'রে—বাস্তবিকই সে ডান পা বাড়িয়ে—বিদ্যুতের মতো ঘুরিয়ে দিয়ে বাঁ হাত—হঠাৎ একটা শক্ত জিনিষ দু' হাতে আঁকড়ে ধ'রে—ডিগবাজি খেয়ে যখন টাল সামলাতে লাগল—তখন সে বুঝতে পারল যে নিজেরই ঘরের বারান্দায় মাতালের মতো পাক খাচ্ছে সে।

নীচের তলায় গুঞ্জরণ শোনা গেল—তারপর ঈষৎ চিৎকার—সোমনাথকে লক্ষ ক'রে নানা রকম সাদর সম্ভাষণ—তারপর দু'-একটা পাটকেল। এত ক্ষণ সে বারান্দায় দাঁড়িয়েই ছিল—এ-বার ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে টের পেল—দরজা তার খোলাই রয়েছে—ভিতরে বাতি তেমনই জ্ব'লে যাচ্ছে।

ঘরের ভিতরে বিদ্যুতের আলোয় চোখ ঝলসে গেল প্রথমে। সেই আলো-অন্ধতার ভিতর এক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোমনাথের মনে হ'ল—সবই ঠিক আছে, কোথাও খোয়া যায় নি কিছু।

খিদে পেয়েছিল—কিন্তু এমন বিশেষ কিছু নয়—নানা জায়গায় অনেক রকম খুচরো খাওয়া চলেছে গত চার পাঁচ ঘণ্টার ভিতর। (এক গ্লাস) জল ঢেলে নিয়ে কাচের গ্লাস হাতে ক'রে নিজের বিবর্ণ কৌচের ওপর গিয়ে বসতেই সোমনাথের বোধ হ'ল এই ঘরের ভিতর কেউ রয়েছে।

মানুষ সাহসী কী ভীরু জোয়ান কী কমজোর এ-সব সহজ প্রশ্ন অবান্তর ব'লে মনে হচ্ছিল তার। এখানে সাহসের কোনও কথা নেই—ভীরুরাও ভয় পাবে না হয়তো। অন্তত সোমনাথ যদি অতিরিক্ত রকমের সাহসী (স্বভাবতই যা সে) না হয়ে ভীরুই হ'ত—তা হ'লেও যেহেতু সে জোয়ান—প্রায় মধ্যবয়সী —ঘরে বিদ্যুতের আলো

অভয়ধর্মী—এবং আরও অনেক সুযোগ সুবিধা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে—এই সব কারণেই সে ভয় পেল না। কিন্তু এই সবই প্রমাণ করে যে সোমনাথ অসমসাহসী না হ'লেও বেপরোয়া সাহসকে কল্পনাসক্ত ক'রে মজিয়ে নিয়ে অনুভূতিপ্রবণ সাহসী মানুষ। সে তাই সমস্ত ঘরটা ঘুরে পরীক্ষা ক'রে দেখতে গেল না; নির্বোধ হঠকারিতার নির্মলতায় বাতি নিবিয়ে শুয়েও পড়ল না বিছানায়—বিশ্রামের দরকার যদিও—এখুনি দরকার—ঘুমও পেয়েছিল যদিও।

সোমনাথ কাচের গ্লাসে ঈষৎ চুমুক দিয়ে আবহটা যত দূর সম্ভব শোষণ ক'রে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল—কথা ভাবছিল। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল না যে তার, তা নয়—কিন্তু সে তার অনুভূতিমদিরতার জন্যে।

কোথাও কিছু নেই তাহ'লে? নিশ্চয়ই কেউ রয়েছে যদিও। হয়তো পাশের কামরায়—সেখানে সে ঢোকে নি এখনও। হয়তো এই ঘরেই—এ-ঘরের বাতিটা নিবোনো—ভালো ক'রে চার দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসরও হয় নি তার।

জল খেয়ে শেষ করতে হবে। ঢক্ ঢক্ ক'রে প্রথম গ্লাস শেষ করেছে—সে। এটা দ্বিতীয় গ্লাস। জুতো খুলতে হবে তারপর—ট্রাউজার টাই—শার্ট—সবই খুলতে হবে।

ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যেই এ-সব সে ক'রে যাচ্ছিল। পায়জামা চপ্পলে ঝর্ঝরে হয়ে একটা শাদা শার্ট পরছিল—হঠাৎ খট্ ক'রে একটা শব্দ হতেই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—কে? বেড়াল না-কি?

—আমি

—তুমি কে?

—বাতি জ্বালিও না, সোমনাথ। আমি।

সোমনাথ তার বিবর্ণ কৌচের ওপর ব'সে প'ড়ে বল্লে—মানুষ নিশ্চয়ই

—স্ত্রীলোক; গলার স্বরেই তো বুঝতে পারছ

—তুমি এখানে!

—আমাকে চিনতে পারছ—

—গলা চেনা ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি কি আমার বিছানায়?

—হ্যাঁ। তুমি চোখে কম দেখ, সোমনাথ।

—হ্যাঁ। চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। চশমা নিচ্ছি না—কোনও-কোনও স্পেশালিস্ট বলে চশমায় হবে না কিছু—চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে আগে কিছু বলো না, আমি ব'লে দেব কে তুমি—তোমার গলা চেনা মনে হচ্ছে।

—চেনা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। কিন্তু তবুও ঠিক ধরতে পারছি না। অনেক দিন আগের কথা—

—অনেক—অনেক দিন—

—হয়েছে কী জান—তোমার গলা আরও দু'-এক জনের গলার মতো। কিন্তু পার্থক্য আছে, অথচ সে-সূক্ষ্মতা ধরবার জন্য

—তুমি মেয়েদের সঙ্গে মিশেছ ঢের—আমার সঙ্গে শেষ দেখা তাদের পর?

সোমনাথ প্যাকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে বল্লে—তুমি যদি অনুমতি কর—তাহ'লে জ্বালাতে পারি—

—দশ পনেরো বছর আগে—

—হ্যাঁ, দশ বারো বছর আগে তোমরা দু' জন ছিলে। কিন্তু সে দু' জনের ভিতর কে তুমি—সেইটেই আমি ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না।

—এখনও না? আমার এত কথা শুনবার পরও? সোমনাথ, তোমার চোখ নেই, কান নেই; বয়েস আজ চল্লিশ পেরিয়েছে। কোথায় সেই কঠিন মানুষটি—জলের তলোয়ারের মতোই ছিলে তুমি এক দিন।

'জলের তলোয়ারের মতো', বিশাখা হেসে বল্লে, কিন্তু এ-উপমা তোমার তৈরি। এ-রকম ব্যক্তিগত ভাষা—না পরিভাষা বলব?

—অতসী, এই বার বাতিটা জ্বালব?

—আমি অতসী? কী আশ্চর্য! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, সোমনাথ।

সোমনাথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে—বিশাখা তাহ'লে—তুমি—কী আশ্চর্য—তোমরা দু' বোনই যে এক রকম (ছিলে)—কথায় বার্তায়—হাসি হুল্লোড়ে—নিজেদের ভিতর ফিরে যাবার শক্তিতে। সেখান থেকে তোমাদের নাবানো কঠিন ছিল।

—নাবানো কঠিন ছিল?

—তা-ই তো মনে হত

—কোনও বিষয়ে তুমি অধ্যবসায়ের পরিচয় দাও নি—এ-কথা আমি বলব না

—তা আর বল কী ক'রে—

—রাত একটার সময় কী ক'রে ওয়াটার-পাইপ বেয়ে উপরে উঠে আসতে হয়—এ তোমার ঢিলেমির পরিচয় নয়। আমি অনেক পুরুষমানুষ জানি যারা বরং ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়ত, তবু—বিশাখা বালিশটা বাঁ কাঁধের নীচে আস্তে টেনে নিয়ে বল্লে : তুমি খুব রিসোর্সফুল, সোমনাথ।

—কিন্তু তবুও হ'ল না তো কিছু—

—আমাদের নাবানো শক্ত ছিল—কিন্তু এ-রকম পাইপ বেয়ে উঠে দেখাতে পারতে যদি আমাদের—তোমার প্রদর্শনীশক্তির জন্যেই নয়, সোমনাথ—অন্য কারণেও তোমাকে ঠিক ক'রে বিচার করবার ভার সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতাম আমি।

—তুমি?

—আমি আর অতসী—আমি একা পারতাম না-কি?

—বারো বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এত দিন কোথায় ছিলে?

—যত জায়গায় থাকা সম্ভব হতে পারে

—শুনেছিলুম প্যারিসে গিয়েছিলে—

—ওঃ—সে-কথা তোমার কানেও ঢুকেছে!

—কবে গিয়েছিলে

—বম্বিংএর সময়

—প্যারিস তো ওপন সিটি হল—জার্মানরা নিয়ে নিলে—

—সে-সব কথা সুযোগ পেলে বলা যাবে, সোমনাথ। সে-সুযোগ জুটবে ব'লে মনে হয় না। আমি গরিবের ঘরের মেয়ে, কিন্তু দামি পুরুষ জুটেছিল—যুদ্ধের সময় ইউরোপে আটকা প'ড়ে গিয়েছিলুম।

সোমনাথ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে—আমার শ' পাঁচেক চিঠি তোমার কাছে আছে—

বিশাখা হয়তো ভুরু কুঁচকে হাসছিল, গলার স্বরে মনে হ'ল, বল্লে—আমি অডিটরগিরি ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। অতসী চালিয়েছিল আরও কিছু দিন। কিন্তু সে-ও বুড়িয়ে গেছে—

—বুড়িয়ে গেছে? তোমাদের বয়স তো তিরিশ-বত্রিশ-এর বেশি নয়। বাতি জ্বালব?

—না

তোমার চিঠি আমাদের কাছে আছে কি না সন্দেহ। তোমাকে বিদায় দেবার পর—সোমনাথ, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো।

গ্লাস এগিয়ে দিয়ে সোমনাথ তার ধূসর কৌচের ওপর এসে বসল।

বিশাখা এক নিঃশ্বাসে জল শেষ না ক'রে আস্তে-আস্তে দুলিয়ে-দুলিয়ে গ্লাস নাচিয়ে-নাচিয়ে খাচ্ছিল—কিছুটা জল তার চোখে মুখে কাপড়ে ছিটকে পড়ছিল।

—কার্লেকারের গোটা পঁচিশেক চিঠি আজও রেখে দিয়েছি; মিস্টার সেনের পাঁচটা (চিঠি আছে;) মজুমদার সাহেবের একখানা, মহলানবিশের গোটা তিনেক—কিন্তু তা আমাদের কাছে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল বাবার কাছে, অথচ আমাদের কটূক্তি ক'রে আগাগোড়া—খুব ঝাল লেগেছিল ব'লে আজও রেখে দিয়েছি।

বিশাখা জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে—অতসী হল মিউজিয়ামের ক্যুরেটর—

—কার্লেকর কে?

—এক জন বিদেশী—

—ওঁর সঙ্গেই ইউরোপ গিয়েছিলে বুঝি

—না। ইফতিকার উদ্দীনের সঙ্গে গিয়েছিলুম

—বিয়ে ক'রেছিলে তাঁকে?

—আমি মুখুজ্যের মেয়ে। বিশাখা হেসে বল্লে—ইফতিকারকে বিয়ে ক'রেছিলুম বৈ কি। নইলে কী ক'রে ইউরোপ যাওয়া সম্ভব হয়। আজকের পৃথিবীতে আইন নেই, কিন্তু তবুও সবই আইনসঙ্গত হওয়া দরকার। আমার জন্যেই শুধু নয়, ইফতিকারের যে-ছেলে হবে—তাকে বে-আইনি পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'লে সেটা কি ভালো হত? শিশুদের বরাবরই কৃপার পাত্র মনে করি। ওরা কেন আনন্দে বঞ্চিত হবে যদি আনন্দে

ওদের জন্ম হয়?

—তোমার ছেলে কোথায়—সোমনাথের সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে আসছিল

—ছেলে নয়। মেয়ে হয়েছিল—

—ওঃ, কত বড়ো হয়েছে। আমি—

—হয়েই ম'রে গেছে—

বিশাখার সহজ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ক'রে তেন্নি স্বাভাবিক গলায়ই সোমনাথ বল্লে—ইউরোপে হয়েছিল?

—না

—ইফতিকার সাহেব এখন কোথায়?

—কেন, দেখা করতে হবে না-কি তার সঙ্গে?

—তোমার খোঁজে এখানে আসবেন না?

—তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য?

—পাইপ বেয়ে উঠতে হবে তাহ'লে

—তার মিনার্ভা গাড়ি এলে সকলেই দরজা খুলে দেবে।

সোমনাথ উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

বিশাখা ত্রস্ত হয়ে একটু নড়াচড়া ক'রে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বল্লে—এটা তোমার অন্যায় হ'ল।

সোমনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—বারো বছর যেন কেটেই যায় নি। যদি বলি অতসীর মতন দেখাচ্ছে তোমাকে।

সোমনাথ পাঁচ-সাত হাত দূরে তার কৌচের থেকে কথা বলছিল।

—সে তো ম্যুজিয়ামের ক্যুরেটর। পুষে রাখে সব। অতসী বলতে পারে তোমার কোনও চিঠি আমাদের কমন্‌ফন্ডে আছে কি-না। যদি থেকে থাকে—একখানা আছে হয়তো—তাহ'লে তার ম্যুজিয়ামে শীগগির তা নষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে অতসীর মতন দেখাচ্ছে সোমনাথ—

—দু' জনেই তো প্রায় এক রকম দেখতে ছিলে। কী যে ব্যতিক্রম ছিল, তখন খুব ভালো ক'রে জানা ছিল—আজ ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

—তা ঠিক। তাই আজও এত দিন পরে তোমার মনে হচ্ছে যে অন্ধকারে—তোমার ঘরে—বিছানার থেকে যে-লোকটা কথা বল্লে সে অতসী না হয়ে যায় না।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বল্লে—অতসীও তো হতে পারত। সে বিয়ে করেছে?

—না

—তোমাদের সঙ্গে ইফতিকার সাহেবের সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিল—?

—না

—কোথায় আছে সে? কী করছে?

—টালিগঞ্জে ইসকুল খুলেছে। অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয় নি আমার।

গেলাসের সব জল শেষ ক'রে গেলাসটা খাটের নীচে সরিয়ে রেখে দিল বিশাখা। বল্লে—অতসীর আর আমার সবই এক রকম। শুধু আমি ওর চেয়ে ঢের বেশি টাকা ক'রেছি—এই। কিন্তু এই জন্য কেমন যেন বিশ্রী লাগে, সোমনাথ

সোমনাথ টেবিল থেকে সিগারেটের কৌটো যোগাড় ক'রে এনে বল্লে—কেন?

—ওকে দেখে যারা আমার কাছে আসে সকলেই আসে প্রায় তারা টাকার মূল্যে। ওয়াকিবহাল হয়ে আসে। মনে হয় আমার। জিনিষটা হয়তো সত্যি নয়—সত্যিই অনেক সময় সত্যি নয়। কিন্তু তবুও এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আমার পক্ষে কঠিন

—অতসীর সঙ্গে তোমার নিজেকে তুলনা ক'রে দেখবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না এখন আর।—সোমনাথ অভয় দিয়ে বল্লে

—কিন্তু কেন? বিশাখা জিজ্ঞেস করল তবুও।

—সে অবিশ্যি আমার এখানে আসত না—

—না। কিন্তু কেন?

সোমনাথ বল্লে—ইস্কুল অতসী খুলেছে। মেয়েদের হাতে তাদের প্রাক্তন পৃথিবীর সমাধির ওপরেই এ-রকম এক-একটা গরমিল তৈরি হয়। ইস্কুল সফল করবার মতন মেয়ে ও নয়। তাদের ধাত আলাদা। কিন্তু বোন তোমার ওষুধ খুঁজে পেয়েছে। তাকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু তবুও—বিশাখা বল্লে—ও-ই আমাকে ভাবিয়ে তোলে। ওকে আমি ঈর্ষা করি, সোমনাথ।

—কেন?

—ওর টাকাকড়ি নেই ব'লে নয়। ওর চেয়ে ঢের বেশি আছে আমার—ওর চেয়ে ঢের সুখে আছি আমি, তাই। ওর চেয়ে ঢের বড়োও আমি, তাই। টাকাটাই সব-চেয়ে বড়ো।

ঘরের চারদিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে বিশাখা বল্লে—কিন্তু কার্লেকারকে দেখেছি—সেনকে দেখেছি—সকলকেই দেখেছি অতসীকে বোনের মতন ভালোবাসে; কিন্তু আমার কাছ থেকে অন্য কিছুর খোঁজ ক'রে। কিন্তু সকলকে আমি সে-জিনিস দেই কী ক'রে!

—দেওয়ার কী দরকার। সোমনাথ বল্লে

—অতসীর ঠিকানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি

সোমনাথ মাথা নেড়ে বল্লে—থাক

—কেন? সময় নেই তোমার—

—না, তা নয়; সময় অতিরিক্ত রকমে রয়েছে ব'লেই মাঝে-মাঝে মনে হয়, কর্মতালিকা কী হবে, শুধুই কি ঘুমোবো আর যা তা মুখে আসে খাব—যে কুড়িয়ে পায় তার সঙ্গেই ঘুরব?

—এই রকম হয়ে গেছে বুঝি তোমার জীবন। তা আমি ভাবছিলুম। কোনও

কাগজপত্রে কোথাও তোমার নাম লেখা দেখা যায় না। কোনও মীটিঙে চেনে না তোমাকে কেউ। সাহিত্যের নানা রকম নামই আজকাল কানে আসে—বইগুলো প'ড়ে দেখা হয় না অবিশ্যি আমার। কিন্তু তুমি তো কোনও বই লেখ নি। লিখেছ সোমনাথ? নাম শুনি নি তো তোমার।

—একটা কিছু করব ভাবছি

—ক' দিন থেকে—?

—তা এই বিশ বছর তো হয়ে গেল!

বিশাখা একটু হেসে বল্লে—এই রকম লোকের জন্যই অতসীর প্রয়োজন। আমি তার জন্য ঘটকালি করতে আসি নি। সে বিয়ে করবে না—করলেও তোমাকে নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংস্রব তুমি আজকাল একেবারেই পরিত্যাগ ক'রেছ (শুনেছি)—তারাই তোমাকে ছেড়ে গেছে হয়তো। শুধু নানা রকম পোলিটিকসের ক্যাম্প-ফলোয়ার হয়ে—এটা করব—ওটা করব—সেটা উচ্ছন্ন যাক মনে ক'রে তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেল তোমার। এ-পথ ছোকরাদের—ওদের মন বর্ণালির মতো ভেঙে পড়ে। কিন্তু আমাদের একটা জিনিসকে ধরতে হবে।

—একটা কিছু করব ভাবছি : সোমনাথ বল্লে।

বিশাখা একটু চুপ থেকে বল্লে—কলকাতা ছেড়ে যাওয়া নয় কোথাও

—না

—এই ঘরেই বারো বছর কাটালে?

—এর আগে ছিলুম—

কিন্তু কথাটা শেষ করলে না সে।

—প্রথম স্ত্রী কোথায়?

—আমি বিয়ে করি নি

—একেবারেই না?

—একেবারেই না। মাঝে-মাঝে দরকার হলে একটু মুস্কিলে পড়ি। কিন্তু সে-সবের জন্যে নানা রকম পথ রয়েছে। কিন্তু সব-চেয়ে নির্বিঘ্ন পথই বেছে নিয়েছি আমি।

সোমনাথ বল্লে—একটা চাকর রেখেছি

—চাকরানি?

—হ্যাঁ। সকালে দু' ঘণ্টা কাজ ক'রে দিয়ে যায়। ওতেই হয়ে যায় আমার। হোটেলে খাই। টাকা অনেক আগে আসত শেয়ার-মার্কেট থেকে—বীরেন মিত্তিরকে চেন? ভুলে গেছ। ও শেয়ার-মার্কেট থেকে টাকা গুছিয়ে আনত, আমি ভাগ ক'রে নিতাম, নিজে যাই নি ও-সব জায়গায় কোনও দিন। বীরেন চ'লে গেলে—রাগ ক'রেই চ'লে গেল, বিয়ে করল, সে তো এখন বড়ো লোক—ব্যাঙ্কে চাকরি নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি;একটা প্রেসে কাজ করব ঠিক ক'রেছিলাম, কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিস—জানা নেই, প্রুফ দেখতেও শিখি নি, আমি শিখে নেব বলতে ওরা রাজি হ'ল

না, ইস্কুলে মাস্টারি মাস দুই ক'রেছিলাম, এক মাস মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলুম, ইংরেজি বা বাংলা খবরের-কাগজে ঢোকা যেতে পারে ভেবে এক মাস (খুব) মন দিয়ে নানা রকম কাগজ পড়েছিলাম। খবরের-কাগজ পড়া সাঙ্গ হ'লে মনে হ'ত হয়তো লীডার লিখতে পারা যাবে—কিন্তু বিকেল বেলা ঘুমের থেকে উঠে মনে হ'ত—পারা যাবে না। কিন্তু তবুও করতুম হয়তো কাগজে কাজ—কিন্তু যুদ্ধ এল—ইনফ্রেশন আরম্ভ হ'ল—ওরা আমাকে দেড় শো টাকা দিতে চাইল—আমি সাড়ে তিন শো'র কমে নিতে পারব না ব'লে দিলুম। ইনফ্লেশন-এর বাজারে সাড়ে তিন শো'র কমে কলকাতায় চলে কী ক'রে, বিশাখা?—

—কিন্তু কিছু না ক'রে চলছে কী ক'রে, সোমনাথ?

—খুব বুম চলছে। আমি আবার শেয়ার-মার্কেটে ঘুরছি

—তুমি নিজে?

—না। এক চাঁই জুটেছে। টাকা কুড়িয়ে আনে—ভাগ ক'রে নেই।

বিশাখা কিছু ক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কী ভাবছিল যেন সে।

সোমনাথ বল্লে—এই বার আমি একটা কিছু করব ভাবছি। ব্যবসা-ট্যবসা। ঠিক ক'রেছি—পেইন্ট-বার্নিশ-এর একটা দোকান খুলব আমরা তিন জনে মিলে। সম্প্রতি গালা তৈরি করব আমি—একাই—ভাবছি। গালা আর ব্যাকেলাইট।

—ব্যাকেলাইট? পুতুলের মতন বল্লে বিশাখা। তার মন চ'লে গিয়েছিল অনেক দূরে।

—এর বাজার রয়েছে কলকাতায়। না, টাকার জন্য আমাকে ভাবতে হবে না। একা মানুষ ব'লেই নয়। বিয়ে করলেও আমি ঠিক ক'রে নিতে পারতাম সব। কিন্তু রুটি খেয়ে—গোস্ত্ রুটি খেয়েও—মানুষের নিজের প্রতি সুবিচার হয় না। তা আমি জানি। কিন্তু কী করব? কোথায় যেতে হবে?—কোন্ পোলিটিকসে

—কোনও পার্টিতেই যেতে পারলে না তুমি।

—সব পার্টিতেই আছি ব'লে মনে হয়; কিন্তু কোনওটাকেই বরদাস্ত করতে পারছি না। ঘরে ফিরে এসে এটা-ওটা-সেটার মোটা কথাগুলো মন্দ লাগে না—কিন্তু দলে ভিড়ে ওদের পার্টি-মিটিঙে গিয়ে যখন নানা রকম মুখ দেখি—নিজেদের জিনিস ছাড়া পৃথিবীর আর সবই মিথ্যা—জানিয়ে দেবার মতো গলার মাৎসর্যের গভীর সততা খুঁজে পাই যখন এর-ওর গলায়—তখন নিজেকে বড়ো অসৎ মনে হয়।

সোমনাথ বল্লে—তা ছাড়া মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তিও আমার নেই। ও-রকম সততা ওরা পায় কী ক'রে—অত কথা গুছিয়ে বলে কী ক'রে। ওদের বক্তব্য অবিশ্যি ছাপার অক্ষরে মনে মোটেই দাগ কাটতে চায় না। কিন্তু মাইকের সামনে ওদের এক-এক জনের এক-এক ঘণ্টা একটা বিচিত্র জিনিসের পরিচয় দেয়। জিনিসটা মহৎ না হলেও ভয়াবহ রকমে সৎ; সত্যিকারের ভয়াবহতা নয়। যে-পথ ধ'রে চলেছি তাতে তো আমাকেও ওদের দিকেই অগ্রসর হতে হয়—কিন্তু আমার সে-জিনিস নেই;

বিচারসহ আবেগ অনুভব করি মাঝে-মাঝে, কিন্তু তাতে কিছু হয় না।

—কিন্তু ও-রকম ভাবে পোলিটিকসে যেতে হবে—ওর কোনও মানে আছে, সোমনাথ?

—অনেক দিন থেকে কংগ্রেস লীগ সোশিয়ালিজম কমিউনিজম করছি, বিশাখা। পার্টি ছেড়ে এখন শুধু বিশুদ্ধ পোলিটিকসে মন দিতে গেলে ভিত শুদ্ধু উপড়ে প'ড়ে যাবে।

—অনেকগুলো পার্টির তো নাম করলে—

—এখন একটা তখন একটা এ-রকম ক'রে ঘুরছি এ-দলে ও-দলে—

বিশাখা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—বারো বছর পরে তোমার সঙ্গে আবার আমার পরিচয় হ'ল, সোমনাথ।

—আমি আজকাল একটু-আধটু মদ খাই।

—সেটা বলা অনাবশ্যক—

—কেন?—সোমনাথ হেসে বল্লে—আমার ঘরে ঢুকেই রকমারি বোতল দেখেছিলে হয়তো। খাবে?

বিশাখা বল্লে—ভোর হতে এখনও ঢের দেরি—ভোরের দিকে এক-আধ চুমুক চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু ও-জিনিস আমি খাই না। সাহেব কখনও আমাকে খেতে বলেন নি। সোমনাথ, তুমি তো মদ খাবেই—

—না খেয়ে থাকব কী ক'রে। কিছুই তো কেউ আমাকে দিল না।

সোমনাথ মদের বোতল খুঁজতে চ'লে গেল। একটা বোতল নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। পেগ আনল, গ্লাসও আনল। সোডা নিয়ে এল। বিশাখার দিকে তাকিয়ে বল্লে—সাজ-সরঞ্জাম ঠিক ক'রে রাখলাম। তোমার ইচ্ছা নেই—আমিও এখুনি চাই না কিছু।

বিশাখা স্কচ বোতলটার দিকে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থেকে সোমনাথের দিকে ফিরে বল্লে—তাহ'লে এই পথ ধ'রেই চল্লে তুমি—

—হ্যাঁ। বোতলের পৃথিবী ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে

—আজও তো মদ খেয়েছ—এর আগে?

—গন্ধ পাচ্ছ?

—পেয়েছি বৈ-কি? ঢোকবা-মাত্রই। কোথায় খেলে?

—আজ? হুমায়ুন প্লেসে—গ্র্যান্ডে—আরও দু'-এক জায়গায়। ছোটখাট নানা রকম পার্টির ভিড়ে—। মানবসেবা নেমে গেল দেশসেবায়, দেশপ্রেম ডুবে গেল দলাদলিতে, পার্টি-পোলিটিকসও মদের বোতলে পর্যবসিত হ'ল অবশেষে। কিন্তু আমি এ-সব সম্পর্কে খুবই সজাগ আছি। সবই বুঝি। বুঝি যে, অত বেশি বোঝা, অত কঠিন ভাবে চোখ শানানো—ভালো নয়। কিন্তু আজকালকার পোলিটিকসে কোনও মুদ্রারাক্ষস এ ছাড়া কী আর করতে পারে। আমি অবিশ্যি ভালোবাসি তাকে, কিন্তু মুদ্রারাক্ষস নই

আমি। কাজেই এ-সব খেতে হচ্ছে আমায়।

বিশাখাকে বল্লে সোমনাথ—আমি এ-সব ছেড়ে দিতে পারি—সব—সব—সে হাত দিয়ে সব সরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে বল্লে—কিন্তু, ছাড়াবে কে? তুমি পারবে (বিশাখা?)

বিশাখা মাথা নেড়ে বল্লে—এ-সব জিনিস নিজেই ছেড়ে দিতে হয়

—বদলে কী গ্রহণ করতে হয়

—সেটা প্রত্যেক পুরুষমানুষ নিজেই ঠিক ক'রে।

—তুমি এত রাতে এখানে কী ক'রে এলে

—সাহেব নিজেই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন—

—কখন?

—রাত ন'টা নাগাদ

—সেই থেকে শুয়ে আছ!

—হ্যাঁ—ঘুমুচ্ছিলুম

—আমি যে এখানে থাকি তা কী ক'রে জানলেন তিনি

—আমি জানতাম

(—সেই খেদ মেটাবার জন্য রেখে গিয়েছেন!)

বিশাখা বল্লে—(বিশ্বাস করবার জন্য)। তোমাদের এই পাঞ্জাবি মুসলমানের বাড়িটা খুব বড়ো বটে। কিন্তু ঘুমোবার জায়গা পেলুম না আর—লোক গিস্‌গিস্‌ করছে সব দিকেই—তোমার ঘরেই আসতে হল। ঘর খোলা ছিল। খুলে রেখে গিয়েছিলে কেন?

সোমনাথ চুরুট জ্বালিয়ে বল্লে—সাহেব হয়তো পাশের ঘরেই

—কী ক'রে বুঝলে তুমি

—ওখানে অ্যাসেম্বলির কয়েক জন মেম্বার থাকে। সলা-পরামর্শ হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ, বাংলা দেশ কী ক'রে শাসন করা যায় সেই জন্য।

—সাহেবের মোটর তো দেখলাম না বাইরে।

—ভিতরে গ্যারেজে এনে রাখা হয়েছে হয়তো। বৃষ্টি পড়ছিল। কিংবা কে জানে চ'লে গেছে। ভোরের দিকে আসবে হয়তো।

সোমনাথ বল্লে—রাত এখন সাড়ে তিনটে, বিশাখা। এখন তাহ'লে খাওয়া যেতে পারে। তুমি খাবে তো?

—সাহেব হয়তো এসে পড়তে পারেন! তুমি খাও। আমি একটু ঘুমোই

কিন্তু ঘুমোল না সে। সোমনাথও ছিপি খুলতে গেল না।

—আমি লিখতে পারি। কিছু দিন থেকে লিখছি। আমার দু'-একটা লেখা তুমি দেখবে?

—এখন নয়।

—তুমি চোখ বুজেই থাক। আমি তোমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছি

—এখন নয়, সোমনাথ।

—ইংরিজিতে লিখি নি কিন্তু

—তা জানি। লিখেছ বাংলায়। প্রবন্ধ নয়—কবিতা হয়তো—হয়তো লিখেছ গল্পই—কিন্তু, তবুও, শোনবার মতো ধৈর্য আমার নেই।

—তুমি ঘুমোতে চাও?

—না

—কথা বলতে চাও?

—বলা তো হচ্ছেই—

—আমার ঘুম পেয়েছে—

—এসো। আমি উঠি তাহলে

—কোথায় যাবে?

—সাহেবের ওখানে। না পাওয়া গেলে আস্তানায় চ'লে যাব। কিংবা—

বিশাখা বল্লে—অন্য কোথাও।

কিন্তু তবুও সে শুয়ে রইল। সোমনাথ মদের বোতলের ছিপি না খুলে বোতলটাকে রেখে এল আর-এক ঘরে যথাস্থানে। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে নিজের বিবর্ণ কৌচে ফিরে গিয়ে বসল সে।

—বারো বছর আগে তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা।—সোমনাথ ঠাণ্ডা গেলাসের দিকে তাকিয়ে বল্লে—তারপরও মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি আমি। কিন্তু আমি জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েছি—(শিখেছি)—ব'লেই ওরা হয়তো হাত বাড়িয়ে জীবনরহস্য জানতে এসেছে আমার কাছে—প্রাণের টানে স্পর্শ উপভোগ করতে দেয় নি। অনেক রকম হাত স্পর্শ ক'রে দেখেছি আমি (বিশাখা।) কিন্তু—

—জ্যোতিষী শিখলে কবে?

—এরই মধ্যে। তোমার হাত বাড়িয়ে দিও না।

—ওদের হাত কেমন লাগল।

—সমুদ্রের পাড়ে ঝিনুক কুড়োতে যেমন লাগে।

—কেমন লাগে তা তো আমার জানা নেই।

—শিশুদের কী মনে হয় তা আমিও ভুলে গেছি। কিন্তু বড়োদের কেমন মনে হয়?

—চ'লে যাবার আগে আমার হাতটা দেখে দিতে হবে এক বার। বড়োদের ভালো লাগে না। একটা নীরস নির্জীব ব্যাপার আর কী। ছোটদের মজা পাইয়ে দেবার জন্য একটা বোকা কাজ করা।

—কিন্তু ঝিনুক নুড়ি ছাড়িয়ে পাশের সমুদ্রটা কী রকম?

—সেটা বেশ

—কত দূর যেতে ইচ্ছে ক'রে?

—একেবারে শেষ অব্দি

—তোমাদের বেলায়ও ঝিনুকই কুড়িয়েছি, কিন্তু তখন শিশু ছিলাম। কুড়োবার সে কী গভীর লোভ! কুড়িয়ে সে কী আশ্চর্য শিহরণ! সমুদ্রও দেখেছি সে-সময়—কিন্তু শিশু ছিলাম। তাতেও উৎসব। কিন্তু বড়োরা সমুদ্র দেখে তাতে প্রবেশ ক'রে একটা গভীর বিষণ্ণতা ও আনন্দ নিয়ে। কৈ, সে-সমুদ্র আজ তো কেউই দেবে না, কিন্তু কেউ তো দান করল না সে-দিন।

—আমরা কি মৃত সমুদ্র

—না

—তবে

—অনেক দূরের সমুদ্র আজ। কাছে যে-সব সমুদ্র দেখতে পাই—সেগুলো—উপলক্ষ পেলে—চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে থাকে মানুষকে—(আমার মতন মানুষকেও)—কিন্তু না চাইলেও হয়তো ঝিনুক নুড়ি দেবে—হাত বাড়িয়ে দেবে জ্যোতিষীকে হস্তরেখা পড়িয়ে নেবার জন্য—কিন্তু নারী যে সমুদ্র সেটা বুঝবার অবকাশ—আমার মতন মানুষের পক্ষে—ওদের মতন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে—অসম্ভব আজ। আমি চাইও না তা।

—কিন্তু অতসীর—আমার—সমুদ্র কি—

—কোথায় স'রে গিয়েছে সে-সব—!

—এই তো এইখানেই আছে। বিশাখা বলতে চাইল। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার মতন সাহস ও আবেগ ও শুকিয়ে গেছে তার। চোখ বুজে শুনতে পেলে সময়ের গতির মতন, শিশিরের শব্দের মতন সুরে সময় তাকে ক্রমাগত শোষণ ক'রে চলেছে, শোষণ করছে তাকে টাকা ও টাকার মানুষগুলো—টাকার চেয়ে যে বড়ো কিছু নেই—এই আন্তরিকতা তার অন্তরকে কী হৃদয়হীন ভাবে শোষণ ক'রে চলেছে। এই সবের থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই সোমনাথের কাছে এসেছিল সে, কিন্তু টাকার চেয়ে বড়ো বাস্তবিকই তো কিছুই নেই—কী আর বড়ো আছে (লাখ) টাকার মানুষগুলোর চেয়ে?—এই সোমনাথ যার এক কপর্দকও নেই?

—'মৃত নয়। র'য়ে গেছে। কিন্তু দৃষ্টি চক্রবালের অতীত—মনে হয় মাঝে-মাঝে সুর ভেসে আসে সে-সব সমুদ্রের। কিন্তু যা শুকিয়ে যাচ্ছে সুর কোথায় পাবে তা—থেকে-থেকে একটা অবক্ষয়ের গুঞ্জরণ ছাড়া'—ভাবছিল সোমনাথ।

—বাস্তবিকই কি তুমি ইফতিকার উদ্দীনকে বিয়ে করেছ, বিশাখা?

—না

—তবে কাকে?

—খুব এক জন বড়োমানুষকে। সাদা বাজারেই বড়ো হয়ে গিয়েছিল। তারপর সময় এল যখন—কালোবাজারও করতে হয়েছে তাকে। এই নাও—ওঁর কার্ড আমার কাছে আছে। ব্লাউজের ভিতর থেকে কার্ড বার ক'রে সোমনাথকে দিল (বিশাখা)।

—যেও আমাদের ও-দিকে বেড়াতে। আমি প্রায়ই থাকি না। এক নাগাড়ে গেলে

এক দিন দেখা হয়ে যাবে।

—এত রাতে আমার এখানে এসেছ তা সে জানে?

—কলকাতায় নেই—সিমলা গিয়েছে।

—আমার ঠিকানা জানলে কী ক'রে?

—মিত্তির সাহেবের কাছ থেকে।

—বীরেন? তোমাদের ওখানে যায়?

—সে-ই তো রেখে গেল আমাকে

—কীসের জন্য?

—তোমার কথা তাকে খুব ক'রে ক' বার জিজ্ঞেস করেছিলুম ব'লে। অভিমান হ'ল তার;না-কি ঈর্ষা। কিন্তু তোমাকে দেখবার দরকার ছিল আমার। ভেবেছিলাম তুমি নতুন কিছু হয়েছ। কিন্তু তুমি আগের মতনই আছ, সোমনাথ;—সেই জন্যই তোমাকে মদ খেতে হচ্ছে। ভোর হয়ে গেছে। ওরা নীচের দরজা খুলে দিয়েছে।

আচ্ছা—উঠি।

—এসো তাহ'লে।

—তুমি নীচে যাবে না আমার সঙ্গে?

—না

বিশাখা চ'লে গেলে সোমনাথ মদের বোতলটা বার ক'রে নিয়ে এল আবার। সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিল—দরজা বন্ধ ক'রে দিল। বিশাখা এত ক্ষণ থাকাতে অনুভূতির দিক দিয়ে সুবিধা হয়ে গেছে। এই বারে জমবে ভালো। একটা অখণ্ড উল্লাসে অন্ধকারে থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিল সোমনাথ।

রচনাকাল : খ্রি. ১৯৪৮
শিরোনাম
কপিকার-নির্বাচিত